প্রভৃতি প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রেরা শুধু অর্দ্ধেক বই পড়িয়াছেন। দ্বিতীয় বার্ষিকের ছাত্রেরা পরীক্ষায় ব্যস্ত, তৃতীয় বার্ষিকের লোকেরা গ্যানো পড়েন নাই।

সুতরাং পুস্তক একাই পড়িয়া বুঝিতে হইবে,—দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথমেই চক্ষুর বিবরণ, কিরূপে চক্ষুতে দৃষ্টি সঞ্চার হয়, কোন্ স্নায়ু ও উপস্নায়ু যোগে চোখের পর্দ্দায় কি ভাবে দৃষ্টি জন্মিয়া থাকে,—এই সকল কথা। আমি তিন ঘণ্টা চেষ্টা করিয়াও তিন পাতা বুঝিতে পারিলাম না। ভয়ে শরীরে ঘাম বাহির হইতে লাগিল। পূর্ব্ব দিনের যে প্রবল উৎসাহ ও উদ্যম ছিল, তাহা কোথায় চলিয়া গেল? যতই বুঝিতে চেষ্টা করি ততই যেন সব আরো বেশী গুলাইয়া যাইতে লাগিল। প্রায় সারা রাত্রি চেষ্টা করিয়া বিফল হইলাম। উদ্যম-হীন দেহ, নিষ্প্রভ চক্ষু লইয়া যেন চারিদিকে আঁধার দেখিতে লাগিলাম। যদি গণিতে ফেল হইতাম, তবে আক্ষেপ থাকিত না। গ্যানোর প্রথমার্দ্ধে যদি কিছু না পাইতাম তথাপি আক্ষেপ থাকিত না, কিন্তু শুধু তিন নম্বরের জন্য সমস্ত মাট হইল এই জন্যই বড়ই আক্ষেপ হইল। আমি হতাশ ভাবে অবসন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। পর দিন বেলা দশটার সময় ঘুম ভাঙ্গিল। কোন মতে কিছু উদরস্থ করিয়া মনে মনে ভাবিলাম, এবার দৈবের উপর নির্ভর করিব। প্রায় তিন শত পত্রের মধ্যে, প্রথম বিষয়টা চক্ষু-সম্বন্ধীয় ১০।১২ পৃষ্ঠা। স্থির করিলাম, এই ১০।১২ পৃষ্ঠা একবারে মুখস্থ করিয়া ফেলিব। ইহা হইতে কোন প্রশ্ন আসিলে পারিব,—না হয় ফেল হইব। একবারে হাল ছাড়িয়া দেওয়া কিছু নয়। সুতরাং প্রায় ৫।৬ ঘণ্টা পড়িয়া সেই ১০।১২ পাতা এক বারে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলাম। পরদিন প্রাতে সেই মুখস্থ জিনিষ-টাকে পুনরায় আবৃত্তি করিয়া লইয়া পরীক্ষা-গৃহে গেলাম। এবং প্রশ্ন হাতে লইয়া দেখিলাম, প্রথম প্রশ্নটি সেই অধ্যায় হইতেই আসিয়াছে—

এবং তাহার নম্বর পাঁচ। আর আমায় পাশ ঠেকায় কে? এখানে বলা প্রয়োজন, তখনকার দিনে পাশ করাটা খুব সোজা ছিল না। পরীক্ষকেরা ছাত্রদেরে ঘাল করিবার জন্যই যেন অস্ত্র শানাইয়াই বসি থাকিতেন।

সাহিত্যিক বন্ধুগণ, বিপদ ও গৃহত্যাগ।

এই ভাবে তৃতীয় শ্রেণীতে এল এ পরীক্ষা পাশ করিয়া তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম। আর কিছু না হইলেও আমি ইংরেজী সাহিত্যে অনেক খানি অগ্রসর হইয়াছিলাম। তখন ইংরেজীতে যাহারা এম. এ পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন, তাঁহারাও অনেক সময়ে আমার সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্য-বিচারে আমাকে পরাভূত করিতে পারিতেন না।

তখন ইংরেজী সাহিত্য যে আগ্রহে পড়িয়াছিলাম, তাহা কতকটা অদ্ভুত রকমের বটে। একটু দূরে থাকিলে রামদয়ালের সঙ্গে চিঠি-ব্যবহার চলিত। সে সকল চিঠি এক একটা অজগর প্রবন্ধ। তাহাতে কত যে ইংরেজীর ফ্রেজ লাগাইবার চেষ্টা, কথায় কথায় বড় বড় কবি গণের লেখা হইতে ছত্র তুলিয়া বাহাদুরী নেওয়া, জীবন-মরণের কত সমস্তার সমাধান, কত প্রণয়ী-প্রণয়িনীর প্রণয়, ধর্ম্ম তত্ত্ব সমাজ তত্ত্ব থাকিত, তা বলিয়া শেষ করা যায় না। রামদয়াল ইহার মধ্যে আবার বারক্লির থিউরির বুকনি দিত এবং 'পারমেমেণ্ট গ্রুপস অব সেন্সেসন' ও শঙ্করের মায়া-বাদ লইয়া তর্ক তুলিত। ইউবার বেগ, মিল ও স্পেন্সারের মত শুনাইয়া দিত। আমরাও তখন বি. এ তে ফিলসফি পড়িতাম, সুতরাং যদিও রাম দয়াল তখন ফিলজফিতে এম এ পাশ করিয়া ছিল, তথাপি আমি তাহার বক্তৃতা গুলির নীরব শ্রোতা ও পাঠক হইয়া থাকিতাম না. কখন ও শিলার যে কিরূপে শৈশবে গাছে চড়িয়া বিদ্যুৎ আকাশের কোন ছিদ্র দিয়া বাহির হয়, তাহাই আবিষ্কারের চেষ্টা করিতেন—সেই

প্রসঙ্গ লইয়া পরে কবিত্বের ফোয়ারা ছুটাইয়া দিতাম, কখন ও বা বাই-রণকে তাঁর পত্নী কেন ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই তত্ত্ব নির্ণয় করিতে যাইয়া আঁধারে ঢিল ছুড়িতাম। রামদয়াল ও আমি একত্র হইয়া তখন কত যে বৈষ্ণব পদ পড়িয়াছি এবং বঙ্গীয় রমণী রচিত সংস্কৃত মাধবীলতার সম্বন্ধীয় "শান্তিময়ি ত্বং মাং কথয়েদম্‌" প্রভৃতি শ্লোক আবৃত্তি করিয়াছি—তাহার লেখা জোখা নাই। কিন্তু তখন রাজনৈতিক বিষয় লইয়া ছাত্রের দল বড় মাথা ঘামাইত না। সে বিষয়টা ইংরেজ শাসকগণেরই প্রায় একচেটিয়া বিষয় ছিল।

ইহার মধ্যে দীনেশ চরণ বসু মহাশয় "ঢাকা-প্রকাশে"র সম্পাদক হইয়া আসিলেন। যে দীনেশ বসুর 'কবি কাহিনী' শৈশবে আমাকে কবিত্বের স্বপ্নলোকে লইয়া গিয়াছে; যাহার "তুই কি জানিবি সখি, মরমের বেদনা ?" এবং "কখনও রন্ধনশালে করিছ রন্ধন, দ্বিগুণ শোভিত মুখ লোহিত বিভায়" প্রভৃতি কবিতা শৈশবে রাত দিন আওড়াইতাম, তিনি আসিয়াছেন শুনিয়া অতিশয় আগ্রহে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। দেখিলাম, ইস্‌লামপুর দ্বিতল বাড়ীর ছোট একটি ঘরে চারিদিকে কাগজের স্তূপ, "ঢাকা প্রকাশ আফিসে" বসু মহাশয় বসিয়া আছেন। তাঁহার বয়স তখন ৩৪, আমার বয়স ১৭।১৮, ঠিক অর্দ্ধেক। বসু মহাশয় চক্ষু দুটি খুব বড় বড়, রংটি ফর্সা অতি মৃদু এবং অল্প-ভাষী, তাঁহার তেজ, বিক্রম কিছুই দেখিতে পাইলাম না, খাটো চেহারাটি। কেবল শান্ত দুটি চোখের অলস মধুর দৃষ্টিতে যেন করুণ কবিত্বের আভা বিকীর্ণ করিতেছিল। কাণে একটু খাটো,--পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্তের মত নহে—যাঁহার সঙ্গে কথা বলিতে হইলে রীতিমত ঢাক বাজাইতে হইত। কতকটা "হিমালয়ে"র জলধর দার মত।

দীনেশবসু মহাশয়ের সঙ্গে শীঘ্রই আমার বেশ ভাব হইয়া গেল, তিনি

ইংরেজীতে সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার ইংরেজী লেখার প্রণালীটিও সুন্দর—বিশুদ্ধ ছিল। আমার শত শত কবিতা তাহাকে পড়িতে দিয়াছিলাম। এবং 'ঢাকা প্রকাশে' আমি কয়েকটি গল্প সন্দর্ভ ও লিখিয়াছিলাম। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন "তোমার কবিতা মাঝে মাঝে দুই একটি ভাল হয়, কিন্তু তা তোমার গল্পের সঙ্গে তুলনীয় নহে—আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি, তুমি গল্প লিখিয়া যশ অর্জ্জন করিবে।" ইহার কিছু পরে আমি সাত পৃষ্ঠা ব্যাপক এক খানি চিঠিতে আমার বাল্য-জীবনের একটা ইতিহাস লিখিয়া পাঠাইয়া ছিলাম, তাহা পড়িয়া তিনি এত খুসী হইয়াছিলেন যে আমাকে তখনই বঙ্গীয় গল্প-লেখকদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট আসন দেওয়ার অনুকূলে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। একদিন বসু মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া আমি ঢাকা কলেজের হোষ্টেল দেখিতে গিয়াছিলাম, কলেজের ছেলেরা তাঁহাকে নানারূপ মিষ্টান্ন ও ফুলের মালা প্রভৃতির দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়াছিল।

ঢাকায় আমি ছাত্র-মহলে কবি ও সাহিত্যিক নামে ইহার মধ্যেই পরিচিত হইয়াছিলাম। তাঁহারা জানিত আমি স্বপ্নলোকে বিচরণ করি। আমার দীর্ঘকেশ,—সংসারানভিজ্ঞতা, পাঠ্য-পুস্তকের প্রতি বিরাগ—সমস্ত বৈষয়িক ব্যাপারের উপর অশ্রদ্ধা—এ সকলই তাহারা কবিত্বের লক্ষণ মনে করিত; এমন কি আমার বড় বড় দুটি চোখ এবং ভূলুণ্ঠিত উত্তরীয়, ও অনির্দ্দিষ্ট ভাবে পথে পদচারণ ও দিবারাত্রি ভেদ-জ্ঞান-হীন তর্কানুরাগ—এ সমস্তই নাকি তাহাদিগকে সেই কথাই বুঝাইয়াছিল। আমি যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলাম, হেম-গিরীশ ছাড়াও এখন তাহার বিস্তর বিস্ময়-বিমুগ্ধ ভক্ত শ্রোতা জুটিয়া গিয়াছিল।

এই খানে আমার ঢাকা-জীবনের শেষ হইবে।

ইহার পর পিতামাতা ও ভগিনীদের মৃত্যুতে আমার বুকের উপর

দিয়া ঝড় বহিয়া গেল, সমস্ত আশা ও উদ্যমের দীপ নিবাইয়া দিয়া গেল। আমার ভগিনী-পতি নবরায় মহাশয়ের বাসা ছিল ঢাকা শাঁখারী বাজারে। আমি ঝগড়া করিয়া তাঁহার বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। একদিন সেই বাড়ীর সংলগ্ন একটা মেসে আমার সহধ্যায়ী একজনের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম— কথা বার্ত্তা বলিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিব, এমন সময় দেখিতে পাইলাম, নবরায় মহাশয়ের বাড়ীর একটা খড়-খড়ীর পাখী খুলিয়া আমার চতুর্দ্দশ-বর্ষ বয়স্কা ভগিনী কাদম্বিনী তাহার শান্ত সুন্দর দুইটি চোখ দিয়া সতৃষ্ণ ভাবে আমায় দেখিতেছে, তাহার নিবিড় চুলরাশি কপালের কাছে দুলিয়া দুলিয়া এক একবার মুখ খানি ঢাকিয়া ফেলিতেছে। মনে হইল একবার যাই দেখিয়া আসি, কিন্তু নবরায়ের সঙ্গে ঝগড়ার কথা মনে হইয়া গেলাম না। এই ঘটনার চার পাঁচ দিন পরে একদিন বেলা পাঁচটার সময় সেই বাড়ী হইতে একটা লোক হাঁপা-ইতে হাঁপাইতে আসিয়া সংবাদ দিয়া গেল, আমার ভগিনী হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে, কিছুতেই জ্ঞান হইতেছে না। আমি, হেম গিরীশ ও জগদীশ দাদার সহিত গিয়া দেখিলাম, কাদম্বিনী যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, নব যৌবন ফুল্ল সুস্থ সুন্দর দেহ যে মৃত্যুর কবলিত তাহা তখন বুঝিয়া ও বুঝিতে পারি নাই। সন্ন্যাস-রোগে সে আমাদিগকে ছাড়িয়া গেল।

তার পর বগজুরী গেলাম। মা কন্যার শোকে কাতর, মৃণ্ময়ী মায়ের কাছে আছে —আমি সন্ধ্যার সময় রোজ মত্ত গ্রামে যাইয়া যাদবানন্দ দাসগুপ্ত কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে গল্পের আড্ডা দিতাম। জমিদার প্রসন্নকুমার সেনের নির্জ্জন বাগান-বাড়ীতে বসিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আলাপ করিতাম। যাদবানন্দ ভারতীতে লিখিতেন—তিনি সাহিত্য-প্রসঙ্গ পাইলে গল্পে মজিয়া যাইতেন। আমি আর তিনি প্রায়ই গল্প করিতে করিতে রাত্রি ১১টা বাজিয়া যাইত। তাঁহার বাড়ী অতি কাছে। আমি

পল্লীগ্রামের সেই নিঝুম মেঠো পথ দিয়া—একা চলিয়া যাইতাম। আঁধার পথ চারিদিকে জঙ্গল, তখন আষাঢ় মাস—পথে সর্পভীতি,—মা এবং আমার সেই ষোড়শ বর্ষীয়া ভগিনী মৃণ্ময়ী ঘুমাইতেন না, তাঁহারা পথের ধারে দাঁড়াইয়া আমি আসিতেছি কি না দেখিতেন। কতবার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেটের কাছে পায়ের শব্দ পাইলে "মিছির"—দারোয়ানকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন "খোকা আসিয়াছে কি?"

এই সকল বৃথা কষ্ট আমি মাকে দিয়াছি।

ইহার একমাস পরে মৃণ্ময়ী ধনুষ্টঙ্কার রোগে প্রাণত্যাগ করে, তিন দিন সে রোগের কষ্ট পাইয়াছিল। তাহার ফুল্ল পদ্ম কোরক তুল্য সুন্দর ও বড় দুটি চোখ চির দিনের জন্ম নিমীলিত হইয়া গেল। তাহার সেই দুটি চোখের কথা মনে পড়িলে এখনও আমি আমার চোখের জল সম্বরণ করিতে পারি না। হিরণ্ময়ী প্রতিমা "মৃণ্ময়ী"র মূর্ত্তি আজ ৩৫ বৎসর পরেও আমি মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখিতে পাই।

পিতা ওকালতী ছাড়িয়া বাড়ী আসিলেন। মা, আমি—আমরা সকলেই মুয়াপুর আসিলাম। ইহার মধ্যে বাতব্যাধি হওয়ায় আমার দক্ষিণাঙ্গ অবশ হইয়া গেল।

ইহার কিছু দিন পরে বহুদিন বহুমূত্র রোগে ভুগিয়া বাবা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন এবং তাহার ৫ মাস পরে হাঁপানি রোগে মা ও তাঁহার কাছে চলিয়া গেলেন। যিনি জীবন ভরিয়া বাবার সঙ্গে কলহ করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি যেরূপ শোকাকুলা হইয়াছিলেন, সেরূপ শোক সচরাচর দেখা যায় না। স্বামী-শোক তিনি দীর্ঘকাল সহিতে পারিলেন না।

ফাল্গুন মাসে আমাদের বাড়ী খালি হইয়া পড়িল, বসন্তের হাওয়ায় আমার নষ্ট স্বাস্থ্যের উদ্ধার হইয়াছিল। আমার দক্ষিণাঙ্গ সবল হইয়া-

ছিল। সাভারের বিখ্যাত স্বর্গীয় গুরুচরণ কবিরাজ আমার চিকিৎসা করিয়াছিলেন।

বাড়ীতে দিদি দিগ্বসনী ও স্ত্রী রহিলেন। আমি বগজুরী মাতুলালয়ে চলিয়া আসিলাম। সেই সময় জীবনে কি অসামান্য দুঃখই না পাইয়াছিলাম! সারা রাত্রি কাঁদিয়া চক্ষু দুটি জবাফুলের মত করিয়া ফেলিতাম, কখনও কবিতা কখনও গদ্য লিখিতে থাকিতাম, চোখের জলে কাগজ ভাসিয়া যাইত,—কখন কাগজ কলম ছুড়িয়া ফেলিয়া আত্মহত্যার জন্য দড়ি খুঁজিতাম। পূজার সময় আসরের আনন্দ আমার নিরানন্দই বেশী জাগাইত, ঢাক ঢোলের বাদ্য অপেক্ষা সদ্য বলী দেওয়ার জন্য যুপকাষ্ঠে বদ্ধ ছাগ শিশুর তীব্র আর্ত্তনাদ আমার মর্ম্মবেদনার অনুকূল হইত। আমি একা এক বিছানায় শুইয়া সেই বলির পাঠার সুরের সঙ্গে সুর মিশাইয়া মা বলিয়া কাঁদিতাম। একদিন প্রভাস যাত্রা হইতেছিল, যশোদা কোনরূপে দ্বারীদের নিকট প্রবেশ পথ পাইলেন না। কৃষ্ণ যজ্ঞ করিতে ছিলেন—হঠাৎ তাঁহার হাত হইতে স্রুক পড়িয়া গেল, তাঁহার যশোদার আঙ্গিনার কথা মনে পড়িল, অমনই বলাই দাদার গলা জড়াইয়া ধরিয়া গাইলেন "দাদা বল বল, আমার দুঃখিনী মা কোথায় গেল" তখন মা যশোদা দ্বারীর নিষ্ঠুরতায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সুরে আমার সমস্ত শরীর কেন কাঁপিয়া উঠিল, আমি কাঁদিয়া আসর ত্যাগ করিলাম। এবং সে রাত্রির মধ্যে চোখের জল একবারও শুকাইল না। মায়ের একমাত্র ছেলে যারা—তারা মাতৃহারা হইলে মায়ের অভাব এমনই করিয়া বুঝিয়া থাকে।

পড়াশুনা ত্যাগ হইল। বাড়ীতে যে দুইটি প্রাণী ছিলেন এবং আমাদের বহুকালের প্রজা ও পরিচারিকা কর্পূরা দিদি—ইহাদের ভরণপোষণের ভার আমার উপর। আমি ঢাকা হইতে শ্রীহট্ট হবিগঞ্জ চলিয়া আসিলাম,

আমার মাতুল এত বড়লোক, আমার অবস্থায় অত্যন্ত দুঃখ করিলেন কিন্তু আমার সঙ্গে একটি লোক দিলেন না। আমি ১৮ বৎসর বয়সে ১৮৮৭ সনে হবিগঞ্জ রওনা হইলাম। তখনও আমি খুব গোঁড়া হিন্দু—জাহাজে কিছু খাইলাম না। সারাদিন উপবাস করিয়া জাহাজে নীরবে মা মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম, কেই বা মাতৃহারা বালকের খোঁজ রাখে! আমার অশ্রুর সাক্ষী শীতলাক্ষা ও ব্রহ্মপুত্র এবং আশ্বিনের সেই শারদীয় আকাশ, যাহা দিয়া হু হু শব্দে বায়ু বহিয়া যাইতেছিল। সন্ধ্যাকালে লালুয়ার টেক নামে এক জায়গায় জাহাজ হইতে নামিলাম। একখানি নৌকা আমার জন্য প্রস্তুত ছিল—তাহাতে উঠিয়া বিল পাড়ি দিতে লাগিলাম ও মাঝিদের উনুন গোময় দ্বারা শুদ্ধ করিয়া হাঁড়িতে ভাত চড়াইয়া দুটি আলু ভাতে দিলাম। সেই বিলে দুরন্ত হাওয়া—তারা ৪৯ ভাই, দুরন্ত শিশুর ন্যায় ছুটাছুটি করিতেছিল, তাহারা আমার উনুনের আগুন ফুঁ দিয়া নিবাইয়া দিতেছিল। ২ ঘন্টা চেষ্টা করিয়া যাহা নাবাইলাম তাহা শুধুই চাল ও ধোয়া আলু—একটুও সিদ্ধ হয় নাই। তখন একদিন যে মাতার রান্না সদ্য ধরা ইলিসের ঝোল ও মাছ ভাজা এবং গোপাল ভোগ চালের ভাত—যাহা ঝরা শিউলী ফুলের মত দেখাইতেছিল, নৌকায় তাহা উপেক্ষা করিয়া যে তাঁর প্রাণে ব্যথা দিয়াছিলাম তাহা মনে পড়িয়া ঝরঝর করিয়া চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। ভাত ও আলু ফেলিয়া দিলাম—শুধু চাল কেমন করিয়া খাইব! মুখ ধুইয়া মাঝিদের দেওয়া একখণ্ড সুপুরী চিবাইতে লাগিলাম ও এক হাতে চোখের জল মুছিতে লাগিলাম—যেন মাঝীরা টের না পায়।

---

(১৫)

হবিগঞ্জে।

তখনও স্কুল বন্ধ হয় নাই, আমি ৪০ টাকা বেতনে হবিগঞ্জস্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। হেড মাষ্টার ফণীভূষণ সেন বি এ (এখন ইনি মিনিষ্টার প্রভাসচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ছেলেদিগকে পড়াইতেছেন) আমার সম্পর্কে মামাত ভাই. দ্বিতীয় শিক্ষক শ্যামচাঁদ বসাক বি এ আমার সহাধ্যায়ী; ইনি গৌহাটি অঞ্চলে অনেক দিন রাজকীয় উচ্চ কাজ করিয়া এখন পেন্‌সন লইয়া ঢাকায় আছেন। আমি ফণীবাবুর বাসায়ই আশ্রয় লইলাম।

ফণীবাবুর পিতা হরিদাস সেন মহাশয় (আমার মাতুল) রোজ সন্ধ্যাকালে বাড়ীর ভিতর আসর জমকাইয়া বসিয়া কত গল্প করিতেন। তিনি রূপ কথার রাজা ছিলেন, কত "বেজান" সহরের কথা, রাজকুমার ও রাজকন্যার, পরী ও দৈত্যের কথা তিনি হাত নাড়িয়া বলিয়া যাইতেন। দাদা, ছোট ভাই বিধু, বৌদিদি ও আমি তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হইতাম। খোয়াই বা ক্ষেমঙ্করী নদীর পাড়ে ছিল আমাদের বাসা, নদীটি পর্ব্বতদুহিতা, ছোট হইলেও দুর্জ্জয় শক্তিময়ী, আমারা তাহার স্রোতে এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতাম না। আমরা রোজই শুনিতাম, আঁধারে গা ঢাকা দিয়া কে একজন নৌকা বাহিয়া যাইত—তাঁহার পুঁজি একটিমাত্র গান ছিল--"মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে আমি আর বাইতে পারি না।" কি মিষ্টি সুর! যেন ১৪।১৫ বৎসরের কোন কিশোরীকণ্ঠ

হইতে সেই অমৃত সংগীত ধ্বনিত হইত। গানটি বহুদূর হইতে ভাসিয়া আসিয়া আমাদের বাসার কাছ দিয়া দূর-দূরান্তরে চলিয়া যাইত। আমরা মনে ভাবিতাম, গায়ক কেমন সুন্দর ; কেউ বলিতেন, "ও কোন ১৬।১৭ বয়সের বামুনের ছেলে, বর্ণ তপ্ত সোনার ন্যায়' কেউ বলিতেন, "ছেলেটি নিশ্চয়ই উজ্জল শ্যামবর্ণ—ঠিক কৃষ্ণঠাকুরের মত," তার সেই সন্ধ্যার অভিসারকে প্রেম-বৈরাগ্য কল্পনা করিয়া আমরা তাহার সম্বন্ধে কত তর্ক বিতর্ক ও জটলা করিয়াছি। একদিন হাটের বার, আফিস স্কুল ছুটি, হঠাৎ বেলা দ্বিপ্রহরে আমাদের বাড়ীর কাছে শুনিলাম "মনমাঝি তোর বৈঠা-নেরে"—সেই চির পরিচিত মিষ্টস্বর—রোজ যাহা সন্ধ্যায় শুনিতাম। বউ-দিদি, দাদা, বিধু এমন কি হুকা হাতে করিয়া মামা পর্য্যন্ত হুড়মুড়ি করিয়া আমরা খোয়াই নদীর পাড়ে গায়ককে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিলাম, গায়ক আমাদের কাছ দিয়া গাইতে গাইতে চলিয়া গেল, দেখিলাম সে অতিবৃদ্ধ জরাজীর্ণ কৃষ্ণকায় একটি বৃদ্ধ, একটি কাঁথা গায়ে দিয়া গান করিতে করিতে বৈঠা বাহিয়া চলিতেছে। আমরা এইরূপ সকল বিষয় লইয়া হবিগঞ্জে আমোদে থাকিতাম।

দাদা মাহিয়ানা পাইতেন ৮০৲ টাকা। মামার ছিল খুব খরচের হাত ; তিনি দশ পনের দিনের মধ্যে সমস্ত খরচ করিয়া ফেলিতেন। দাদা মামাকে খুব ভয় করিতেন, কিন্তু এইরূপ অতিরিক্ত খরচের জন্য আমার কাছে প্রায়ই বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। একদিনের কথা মনে আছে, দাদা সেই দিন মাহিয়ানা পাইয়া টাকা মামার হাতে দিয়াছেন। মামা বৈকালে "ফুকাই" চাকরকে সঙ্গে করিয়া বাজারে গেলেন। সন্ধ্যার পর দেখিলাম, ফুকাইএর মাথায় একটা গন্ধ-মাদন প্রতিম বোঝা চাপাইয়া মামা হন্ হন্ করিয়া আসিতেছেন ; তিনি উঠানে বোঝা নামাইবার আদেশ দিয়া দাদাকে বলিলেন "দেখ—এই চিতল মাছটা, তুমি ইহার

পেটিটা ভালবাস, সস্তায় পাইয়াছি, মাত্র ২৲ টাকা হইয়াছে। আর একটা ডেগ আনিয়াছি ৭।৷৹ টাকা, বউমা মেটে হাঁড়িতে রান্না করিতে কষ্ট পান" —মামার সাগ্রহ বর্ণনায় বাধা দিয়া দাদা বলিলেন "একদিনেই যদি এত খরচ করিয়া ফেলিলেন, মাসের বাকিটা কি করিয়া চলিবে ?" এই কথায় মামার সমস্ত আগ্রহ জুড়াইয়া গেল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া ফুঁকাইএর দ্বারা এক সিলিম তামাক সাজাইয়া দাওয়ায় বসিয়া টানিতে লাগিলেন।

রান্না হওয়ার পর খাবার ডাক পড়িল। মামা বলিলেন "ক্ষুধা নাই।" বৌদিদি যাইয়া মামাকে ডাকিতে লাগিলেন একই উত্তর "ক্ষুধা নাই।" মামী যাইয়া পীড়াপীড়ি করিলেন, বিধু যাইয়া বলিল "বাবা, আসুন খাই গিয়ে।" কিন্তু তাহার সেই একই উত্তর। দাদা তখন বলিলেন,—"সংসারে ধার কর্জ্জ হইলে শেষে মুস্কিল হইবে, এজন্য কি একটা কথা বলিয়াছি যে তার জন্য এমন কচ্ছেন ? আমায় "না হয় মাপ করুন।" কিন্তু মামা কপট সারল্য দেখাইয়া বলিলেন,"না সত্যিই বল্‌ছি আমার ক্ষুধা নাই, এই বলিয়া কৃত্রিম ঢেকুর তুলিয়া বাক্যের সত্যতা প্রমাণ করিতে লাগিলেন ; ফুকাই ক্রমাগত তামাক যোগাইতে লাগিল এবং তিনি ক্রমাগত সেইভাবে গুড়ুক টানিতে লাগিলেন। আমাকে মামা বড়ই ভালবাসিতেন, সকলেই তাঁহাকে সাধিল, কিন্তু আমি সাধি নাই। যখন সকলে হতাশ হইয়া বলিলেন "কি হইবে ? উনি যখন খাইবেন না, চল আমরা যাইয়া খাই" এবং আমার ডাক পড়িল, তখন আমি বলিলাম, "মামা খাইবেন না" ? উত্তরে শুনিলাম তিনি কিছুতেই সম্মত হন নাই, তখন আমি বলিলাম "আমার ক্ষুধা নাই, আমি খাইব না" আমাকে জনে জনে আসিয়া সাধিতে লাগিলেন, আমি সেই একই উত্তর দিলাম। তখন দেখি মামা স্বয়ং হুকা হাতে আসিয়া আমায় বলিলেন "সে কি কথা, এমন সুন্দর চিতল মাছটা

এনেছি, তুমি খাইবে না ?" আমি বলিলাম "আপনি না খাইলে আমি খাইব না ।" অনেক কথা কাটাকাটির পর আমার জয় হইল। তিনি খাইলেন। খাওয়ার পর কুকাইএর হাতের তৈরী আর একবার গুড়ুক টানিয়া বেজায় স্ফূর্ত্তির সহিত বলিলেন "একটা সহর, তার মানুষ পাথর, গাছ-পাতা পাথর, গরু ঘোড়া প্রভৃতি জীবজন্তু পাথর, পাখী পাথর, পিঁজরায় দেওয়া জল ও চাল সকলই পাথর, সেই সহরের নাম "বেজান সহর" ইত্যাদি।

এইরূপ নানা ভাবের তরঙ্গে দিন কাটিয়া যাইত। রাত্রি হইলে কবিতা লিখিতাম, ইংরেজী বই পড়িতাম; রাত্রি যতই নিঝুম হইত, ততই মায়ের জন্য—বাবার জন্য প্রাণটা ছটফট করিয়া উঠিত, চক্ষে অবিরল ধারে জল পড়িত। দাদাকে যখন মামী "খোকা" বলিয়া ডাকিতেন, তখন আমায় যিনি ঐরূপ ভাবে ডাকিতেন, তাঁর কথা মনে করিয়া কষ্টে অশ্রুজল সংবরণ করিতাম। কতদিন গভীর রাত্রে উঠিয়া খোয়াই নদীর পাড়ে পদচারণ করিতে থাকিতাম, এবং একবার মনে করিতাম, "এই তেজস্বিনী নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়ি, ইনি মাতৃহারা বালককে আশ্রয় দিবেন।" ঢাকায় থাকিতেই গোঁড়ামি ছাড়িয়া কয়েক দিন ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিয়াছিলাম। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একবার ঢাকায় আসিয়াছিলেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'যোগ' 'যোগ' যাহা শুনি, উহাই কি ভগবানকে পাইবার উপায়?" গোস্বামী মহাশয় তখন অনেকটা হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন—যোগ সাংসারিক বিষয় লইয়াও হইতে পারে—যোগবশিষ্ঠ রামায়ণে এইরূপ একটা প্রশ্ন বশিষ্ঠকে রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠ উত্তর না দিয়া বলিলেন, মহারাজ—ঐ যে অদূরে বৃহৎ গাছটি আছে, উহা মূল শুদ্ধ তুলিয়া ফেলিতে আদেশ করুন, কিন্তু সাবধানে কোদাল চালাইতে হইবে, উহার নীচে একটা মানুষ আছে,

তার গায়ে যেন আঘাত না লাগে।" সেই ভাবে গাছটি উৎপাটন করিয়া সত্য সত্যই তাহার অনেকটা নীচে একটা জড়বৎ অজ্ঞান মানুষ বাহির হইল। বশিষ্ঠ যাইয়া নিজের হাত সেই লোকটার মুখের ভিতর দিয়া জিভটাকে টানিয়া সোজা করিয়া দিলেন, সে লোকটা জ্ঞান পাইল ও লাফাইয়া উঠিয়া রামচন্দ্রের কাছে যাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "মহারাজ বক্‌সিস্ দিন" রামচন্দ্র কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, বশিষ্ঠ বলিলেন—এই লোকটা যোগ অভ্যাস করিয়া কুম্ভক করিতে শিখিয়াছিল—শুধু অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে। এ ব্যক্তি কুম্ভক করিয়া অনেকটা উর্দ্ধে উঠিতে পারিত এবং নীচে নামিয়া পড়িলে দলের লোকেরা জিভ টানিয়া সোজা করিয়া দিলেই আবার জ্ঞান লাভ করিত। এই অবস্থায় একদিন লোকটি উর্দ্ধদেশ হইতে এক জলাশয়ে পড়িয়া যায়—সঙ্গীরা ইহাকে খুঁজিয়া না পাইয়া চলিয়া যায়। তারপর বহু যুগ চলিয়া গিয়াছে, জলাশয়ের জল শুকাইয়া তার উপর এই প্রকাণ্ড বৃক্ষটা হইয়াছিল; নিশ্বাস রোধ করিয়া জিভ ব্রহ্মতালুতে ঠেকাইয়া থাকাতে—উহার দেহ অবিনশ্বর হইয়াছিল। এখন আমি উহার জ্ঞান দিয়াছি। এ ব্যক্তি মনে করিতেছে, আপনি সেই রাজা, যাঁহার নিকট আকাশে উঠিয়া তামাসা দেখাইয়াছিল—এজন্য বক্‌সিস্ চাহিতেছে. তারপর যে কত যুগ চলিয়া গিয়াছে তাহা উহার জ্ঞান নাই।"

এই বলিয়া গোস্বামী মহাশয় বলিলেন যোগ তাঁহাকে পাইবার পথ ও হইতে পারে; সাংসারিক সুখ ভোগ, ঐশ্বর্য্য লাভ প্রভৃতির উপায় ও হইতে পারে—উহা কতকটা শক্তি-লাভ মাত্র, অভ্যাস দ্বারা উপার্জ্জন করা যায়—ব্রহ্ম লাভের সঙ্গে উহার অপরিহার্য্য সাহচর্য্য নাই।

ইহার পর ঢাকার রামকুমার বিদ্যারত্ন আসিলেন, ইনি একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম ছিলেন। ইঁহার মূর্ত্তি একবার 'সাহিত্যে' বাহির হইয়াছিল, এত বড়

লম্বা দাড়ী খুব কমই দেখা যায়। বিদ্যারত্ন মহাশয় ছাত্রদের জন্য একটা "সঙ্গত" সভা স্থাপন করিয়াছিলেন, আমাদের তাঁহার কাছে রোজ কি করি তাহা লিখিয়া দেখাইতে হইত। কি কি পাপ চিন্তা করি, কি কি কাজ করি, সকলই লিখিতে হইত। এই নিলর্জ্জতা আমি পছন্দ করি নাই—সুতরাং কতক দিন মাত্র তথায় যাইয়া আমি ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করিয়া দিয়াছিলাম।

খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি সকলের সঙ্গে মিশিয়া দেখিলাম, শান্তি তো কোথাও পাওয়া গেল না। হবিগঞ্জ বসিয়া অনেক সময় একটা শান্তির স্থল খুঁজিতে থাকিতাম। কোথায় কে আছে, আমার মা যেমন ছিলেন, বাবা যেমন ছিলেন—এমন কি কেউ নাই? যিনি ইহাঁদিগকে দিয়াছিলেন, তিনি কি আমায় ছাড়িয়া দিলেন? এত আদর দেখাইয়া হঠাৎ আমাকে পথের ছেলের মত অনাথ করিয়া ফেলিলেন?

তার পরের বছর পূজায় বাড়ী আসিলাম, একজন বলিলেন, "ওরে বি, এ পরীক্ষাটা দিলি না?" আমি বলিলাম "দেব"; প্রশ্নকারী অবজ্ঞার ভাবে বলিলেন "আর দিয়াছিস্?" সেই অবজ্ঞা আমার মনে বড়ই লাগিল। আমি সেই দিনই থ্যাকার স্পিঙ্কের বাড়ীতে অর্ডার দিলাম। বই আসিল, ইংরাজীতে অনার দিব—স্থির করিলাম। কিন্তু ইংরেজীর ছয় খানি বই পাইলাম না।

অপরাপর বই যে দিন পাইলাম, তার পর দিন হবিগঞ্জ রওনা হইলাম। হবিগঞ্জ আসিয়া আমার জর হইল—বড় প্রবল জর, কারণ আমি জীবনটাকে বৃথা মনে করিয়া স্বাস্থ্যের কোন নিয়মই পালন করি নাই। এক মাস জরে ভুগিয়া প্রায় মৃত্যুর সন্নিহিত হইলাম, তখন সুয়া-পুর হইতে দিদি এবং স্ত্রী আসিলেন। আর ও এক মাস পরে জর ছাড়িয়া গেল, তখন পরীক্ষার দেড়মাস বাকী, আমি ফিস্ দিলাম। দাদাকে

বলিলাম, ইংরেজী ও ইতিহাসে, কিছু না পড়িলে ও, পাশ থাকিবে—শুধু পলিটিকাল ইকনমিটি পড়িব, এইটি নূতন – এই দেড় মাস স্কুলে পড়াইয়া "ফসেট" খানি ভাল করিয়া পড়িলাম। তার পর পরীক্ষা দিতে গেলাম। ইংরাজীর ছয় খানি বই চক্ষে দেখি নাই, বাকী গুলি দুই চার দিন পড়িয়াছি, তথাপ ইংরেজী ও ইতিহাসে আমার এমন সাধারণ জ্ঞান ছিল যে আমি ভয় খাইলাম না।

পরীক্ষা দিয়া হবিগঞ্জ ফিরিলাম, যথা সময়ে কয়েক জন পাশ হইয়াছেন, তাহাদের টেলিগ্রাফ আসিল। আমার বিস্তর বন্ধু ও আত্মীয় ছিলেন, নিশ্চয়ই পাশ হইলে তাঁহারা টেলি করিতেন। এমন কি অনেকের খবর চিঠিতেও পাওয়া গেল, তখন নিশ্চয় বুঝিলাম ফেল হইয়াছি। ফল ভাল না হইলেও কোন পরীক্ষায় এ পর্য্যন্ত ফেল হই নাই। গণিতের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া ভাবিতাম, ইহার হাত এড়াইলে তো হাসিয়া খেলিয়া পরীক্ষা পাশ হইব, কিন্তু কি দুর্দ্দৈব যে গণিত শূন্য বি, এ পরীক্ষায় ফেল হইতে হইল! যে দিন অনেকের পাশের খবর চিঠিতে আসিল তার পর দিন পোষ্ট আফিসে যাইয়া একটা টেবলের উপর যাইয়া পড়িয়া রহিলাম। পোষ্ট মাষ্টার মথুর বাবু আমাদের বন্ধু, তিনি কত আদর করিলেন, দাদা আসিলেন—তথাপি আমি টেবিল শয্যা ত্যাগ করিলাম না, স্কুলে গেলাম না। যখন খাওয়ার জন্য বড় বেশী রকমের পীড়াপীড়ি চলিল, তখন হঠাৎ খিড়কীর দোর দিয়া বাহির হইয়া অনির্দ্দেশে এক দিকে চলিতে লাগিলাম। বেলা ১১॥ টার সময় বাহির হইয়া ছিলাম কত দুর গেলাম তাহার ঠিক নাই; কত পল্লী, কতক কৃষক, কত হাটের লোক ঘাটের লোক দেখিতে দেখিতে চলিলাম—তাহার ঠিকানা নাই। এক একবার মনে ভাবিলাম হয় ত কোন পল্লীতে যাইয়া দেখিব, আমার নৈশ-খাদ্যের থালা হাতে করিয়া মা আমাকে ডাকিয়া খাওইতে

বসাইবেন, আমি আবার তাঁহার হাতের রান্না খাইব।" এই ভাবিতে চোখের জলে গণ্ড ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সারাদিন উপবাস, অন্ধকার রাত্রি—কোথায় চলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই, একটা যায়গায় পৌছিয়া আবার ফিরিয়া আসিতে লাগিলাম। রাত্রি ১১টার সময় বাসায় ফিরিলাম, দেখি মামা, মামী, দাদা, বিধু, বৌ-দিদি সকলেই আমার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া আছেন, কত স্থান খুঁজিয়াছেন। আমার প্রত্যাগমনে তাঁহারা যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। ১২ ঘণ্টা হাঁটিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আমি মড়ার মতন হইয়া পড়িয়াছিলাম। আহারান্তে আঁচাইতে খোয়াই নদীর ঘাটে গেলাম, তখন বেলে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছে। খোয়াইএর জলের প্রতি আমার একটা দুর্নিবার লোভ ছিল, যখন কোথাও খুঁজিয়া মাতৃ-ক্রোড় পাইলাম না, তখন একদিন ঐ নদীর জলে যাইয়া চরম শান্তি খুঁজিব। সে দিনও আঁচাইতে আঁচাইতে ভাবিতেছি—'এই জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলে হয় না?' এমন সময় দাদা আমার দেরি দেখিয়া হাত ধরিয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন। ঘরে ঢুকিব এমন সময় দেখি পোষ্ট মাষ্টার মথুর বাবুর বড় ছেলে বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া "দীনেশ বাবু বাড়ীতে আছেন?—সুখবর"—বলিয়া চেঁচাইতেছে। রামদয়াল কলিকাতা হইতে চিঠি লিখিয়াছে, আমি ইংরাজীতে অনার সহ বি, এ পাশ করিয়াছি।

(১৬)

কুমিল্লায় চাকুরী।

যাহা হউক একরকম পাশ হওয়া গেল। ইহার পরে কুমিল্লা শম্ভুনাথ-ইনষ্টিটিউসনের ৫০৲ টাকা মাহিয়ানার হেডমাষ্টারি পদ খালি হইয়াছে বিজ্ঞাপন দেখিয়া দরখাস্ত করিলাম। কুমিল্লা আমার শ্বশুর উমানাথ সেন, ও আমার পিতার মাতুল চন্দ্র মোহন দাস ছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং সে জায়গাটার উপর আমার একটা লোভ ছিল,—কাজ জুটিয়া গেল। যে দিন নিয়োগ-পত্র পাইলাম, সেই দিনই কাল-বিলম্ব না করিয়া পত্নীও সদ্য জাতা প্রথমা কন্যা মাখনবালাকে লইয়া হবিগঞ্জ ত্যাগ করিলাম।

কুমিল্লার জীবন স্মরণ করিতে এখনও আমার হৃৎপিণ্ড কাঁপিয়া উঠে। কত দুঃখই না সহিয়াছি! আমার গ্রহগণ সকলেই তখন আকাশ হ'তে বোধ হয় এক যোগে আমার দিকে ক্রুদ্ধ-নেত্রে তাকাইতেছিলেন। প্রথম হইতেই ঝগড়া, আত্মীয়েরা পর হইলেন, যে দুই এক জনকে যথা সর্ব্বস্ব হারাইয়া একমাত্র আশ্রয়ের ন্যায় আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলাম, তাঁহারা পর হইলেন। শ্বশুর-শাশুড়ী পর হইলেন। চন্দ্রমোহন দাস আমার প্রতি বিমুখ হইলেন, এবং আমার বড় ভগিনী দিগ্বসনী দেবী ঝগড়া করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কাশী চলিয়া গেলেন।

নিজকে তেমন একা আর কখনও মনে করি নাই। মনে কেবল এক ইচ্ছা জাগিতেছিল কি করিয়া প্রাণত্যাগ করা যায়। কত দিন মনে ভাবিয়াছি, কাহাকেও বাঘের মুখ হইতে রক্ষা করিতে যাইয়া যদি নিজে প্রাণ দিতে পারিতাম, কোন শিশুকে জল মগ্ন হওয়া হইতে বাঁচাইতে যাইয়া যদি মরিতে সুযোগ পাইতাম,—প্রাণ ত দিবই কিন্তু কাহারও মূল্য বান জীবনের পরিবর্ত্তে যদি আমার এই ছার প্রাণটা দিতে পারিতাম, তবে মৃত্যু সার্থক হইত! আঁধার রাতে দুর্গম পথে চলিয়া গিয়াছি নিবিড় মেঘ গর্জ্জনের সঙ্গে মন হইতে আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে—আমি সেই সর্প-বহুল জঙ্গলের পথে এত অন্ধকারে প্রাণ তুচ্ছ করিয়া চলিয়াছি,—কিন্তু আর আমার মা নাই, যিনি উৎকণ্ঠিত চক্ষু দুটি আমার পথের দিকে ফেলাইয়া রাখিবেন। বিদ্যুৎ দেখিলে ছাতা খুলিয়া মাথায় দিয়াছি, শুনিয়াছিলাম, ছাতার লৌহ বিদ্যুৎ আকর্ষন করে—অন্ধকারে যেখানে জঙ্গল বেশী সেই পথে চলিয়াছি, কিন্তু উরগ জাতীয় কোন বন্ধু আমার ভবপারের কাণ্ডারী হইয়া দর্শন দেয় নাই।

কুমিল্লা আসার পর আমার শ্বশুর মহাশয়ও ঠাকুরদাদা চন্দ্রমোহন বাবু বলিলেন, "তুমি কিছু না জানিয়া দরখাস্ত করিয়াছ। শম্ভুনাথ স্কুল স্কুলই নহে। ভিক্টোরিয়া স্কুলের কয়েকটি বিদ্রোহী ছাত্র একটা স্কুল খুলিবার চেষ্টা করিতেছে। শম্ভুনাথ নামক এক ধনী হিন্দুস্থানীর নামে স্কুলটা হইয়াছে; কিন্তু তিনি কয়েক দিনের জন্য ছেলেদিগকে স্কুল করিবার জন্য কয়েকটি তাঁবু দিয়াছিলেন—বাড়ী নির্মান কি অন্য কোন বিষয়ে কিছুই সাহায্য করেন নাই। এখন কয়েকটা ভাঙ্গা খড়ো ঘরে স্কুল বসে, মাষ্টাররা মাহিয়ানা পান না, তাঁহাদের গুণ পণা ও কিছুই নাই; অম্বিকা-বাবু সেক্রেটারী, তাঁহার খুব আগ্রহ আছে—কিন্তু পয়সা কড়ি নাই তিনি কি করিবেন?"

চন্দ্রমোহন বাবু বলিলেন - "একবারে আমাদের জিজ্ঞাসা করিলে না, অমনই দরখাস্ত করিয়া বসিলে ?" শ্বশুর-বাড়ীর সম্মোহন আকর্ষন যে আমাকে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য করিয়া টানিয়া আনিয়াছিল, তাহা তাঁহাকে কি করিয়া বলিব !. সুতরাং চুপ করিয়া রহিলাম।

যাহা হউক স্কুলে যাইতে লাগিলাম। দেখিলাম মাষ্টাররা যখন ইচ্ছা আসেন, যখন ইচ্ছা যান,—আমি কৈফিয়ৎ চাহিলে মুচকি হাসিয়া পাশ কাটিয়া যান্। কেহ একটায় আসেন, দুইটায় যান, কলেজের প্রফেসারদের মত—গুণপণা ও সেইরূপ। একজন একটি ছাত্রকে দাঁড় হইবার জন্য বারংবার বলিতে ছিলেন 'stood up', 'stood up'. আর এক জন ইতিহাসে পড়াইবার সময় একটি ছত্র পাইলেন Babar founded the Mogul Empire" অমনই চাৎকার করিয়া টিপ্পনি করিতে লাগিলেন, "find found, found এই তিনরকম পদ ব্যাকরণ-শুদ্ধ, কিন্তু এখানে লেখক founded লিখিয়াছেন, সাহেব কি না—যা ইচ্ছা লিখিয়া পার পাইলেন, বাঙ্গালী হইলেই তাহার টিকিতে হাত পড়িত।"

আমি আমার আত্মীয় ইন্‌স্পেক্টর দীননাথ সেন মহাশয়কে লিখিলাম "শম্ভুনাথ ইনষ্টিটিউসনের এ্যাফিলিয়েট হওয়ার কোন সম্ভব আছে কি না ?" তিনি অতি স্পষ্ট করিয়া একবার নির্লজ্জ অকপটতার সহিত আমাকে জানাইলেন—"কোন সম্ভাবনাই নাই" কারণ—ইঁহাদের ফণ্ডে কোন অর্থই নাই. যদ্দারা একটা এণ্ট্রান্স স্কুল চলিতে পারে।"

অম্বিকাবাবু কিন্তু আমার বেতনটি মাসের প্রথম তারিখেই জোগাইতেন। স্কুল এফিলিয়েট হইলেই অপর সকলকে মাহিয়ানা দিবেন, এই ভরসায় তাঁহাদিগকে খাটাইতেছিলেন, এজন্যই তাঁহাদের গুণপনা ও ব্যবহারের কোন শৃঙ্খলা বা শোভা ছিল না। কিন্তু ছাত্রগণ ভিক্টোরিয়া স্কুলের উপর হাঁড়ে চটিয়াছিল,—বর্ষাকাল ছেড়া ছনের ছাউনির মধ্য দিয়া

ধরে বেশ খরপ্রবাহে জল পড়িয়া তাহাদের মাথার চুলে শিবজটাবদ্ধ গঙ্গার ন্যায় আটকাইয়া যাইত,—তাহা তাহারা মাথা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তদ্বিরুদ্ধে কোন আপত্তি করিত না। বৃষ্টি পড়িতে সুরু করিলে দুই তিন জন ছত্রধরের ন্যায় আমার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইত, আমার মাথা জল হইতে রক্ষা করিবার জন্য। সেই ভাঙ্গা, কপর্দ্দক শূন্য নিরাশ্রয় স্কুলটির প্রতি তাহাদের মমতা দেখিলে আমার বড় কষ্ট হইত। ইহার মধ্যে তাহারা খুব বড় একটা সভা করিল, তাহাতে আমি ইংরেজীতে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া অল্প সময়ের মধ্যে যশস্বী হইয়া পড়িলাম। জেলাস্কুল এমন কি ভিক্টোরিয়া স্কুল হইতেও ছাত্রগণ আমার কাছে পড়া বুঝিয়া লইবার জন্য এবং আলাপ দ্বারা আপ্যায়িত হইবার জন্য আসিত।

আমি আমার শ্বশুর ও ঠাকুরদাদার তাড়নায় একদিন বাধ্য হইয়া ভিক্টোরিয়া স্কুলের সত্ত্বাধিকারী জমিদার আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের সঙ্গে সন্ধ্যাকালে দেখা করিতে গেলাম। ভিক্টোরিয়া স্কুল তখন খুব জাঁকের স্কুল—জেলা স্কুলের মতই তাহার প্রতিপত্তি।

আনন্দবাবু এমন দেখাইলেন যে তিনি যেন আমার প্রতীক্ষা করিয়াই বসিয়াছিলেন। আমার অধ্যাপনা প্রভৃতির সুযশ তাঁহার কানে পৌঁছিয়া ছিল, তিনি বলিলেন—"আমার এখানেই আপনার স্থান, আপনি ওখানে থাকিতে পারিবেন না, তা আমি পূর্ব্বেই জানিতাম" আমি প্রথম দিনই তাঁহার বন্ধু হইলাম, তিনি প্রথম হইতেই আমার বন্ধু হইলেন। আমার বহু কষ্টের মধ্যে একমাত্র সহৃদয় উপদেষ্টা তিনি ছিলেন, তাঁহার দুঃখের সময় আমি সর্ব্বদা পার্শ্বচর ছিলাম। কুমিল্লা জীবনের নিবিড় ঘনান্ধকারে তাঁহার বন্ধুত্ব আমার পক্ষে একমাত্র আলোক-সঞ্চারী বিদ্যুল্লেখা।

কয়েক বৎসর হইল "রায় বাহাদুর আনন্দ চন্দ্র রায়" স্বর্গীয় হইয়াছেন। ইহাঁর মত মহাপ্রাণ লোক সংসার বড় সুলভ নহে।

ইহার পরে স্কুলের আয় ব্যয় ও শিক্ষকদের ব্যবহার লইয়া আমার সঙ্গে অম্বিকাবাবুর তর্কবিতর্ক হইতে লাগিল। দাদা মহাশয় চন্দ্র মোহন দাস বলিলেন, "তুমি কিছুতেই শম্ভুনাথ স্কুলে থাকিতে পার না, স্কুলটি ত তাসের ঘর। এখানে পুতুল খেলা করিয়া নব যৌবনের প্রথম উদ্যমটা নষ্ট করিয়া ফেলিবে? এই স্কুল ত কিছুতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডীতে স্থান পাইবে না, তা ত বুঝিতে পারিয়াছ, এখানে কেন পড়িয়া থাকিবে?"

কিন্তু অম্বিকাবাবু সমুদ্রে পড়িয়া যেরূপ লোকে তৃণ আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই ভাবে আমাকে আকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। ছাত্রগণ আমার প্রতি অনুরাগী ছিল, ইন্স্পেক্টার দীনুবাবু আমার আত্মীয় এই ভরসায় তিনি আমাকে অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমি দাদা মহাশয়কে বলিলাম —"এই ব্যক্তির আহ্বানে আমি হবিগঞ্জে, হইতে চলিয়া আসিয়াছি ইনি রীতিমত আমার বেতন দিয়া আসিতেছেন, ইহাঁকে ছাড়িয়া গেলে কি আমার পাপ হইবে না?" দাদা মহাশয় ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "তুমি যদি এতটা জ্ঞানী হইয়া থাক, অম্বিকা বাবুকে বল তিনি তিন বছরের গ্যারাণ্টি দিন—যদি স্কুল না থাকে, তবু তোমার মাহিয়ানা তিন বছর চালাইবেন। নতুবা যে ঘরে আগুন লাগিয়াছে, সে ঘরে বসিয়া থাকা ঠিক বুদ্ধিমানের কর্ম্ম হইবে না।"

অম্বিকাবাবু তিন বৎসরের গ্যারাণ্টি দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু দাদা মহাশয় বলিলেন "আপনি নিঃসম্বলব্যক্তি, আপনার গ্যারাণ্টির মূল্য কি? আপনি আপনার নিকট আত্মীয় আনন্দবর্দ্ধন মহাশয়ের সই আনুন, তবে সেই গ্যারাণ্টি আমরা স্বীকার করিয়া লইব।" "তাহাই আনিব।" বলিয়া অম্বিকাবাবু চলিয়া গেলেন। আনন্দবর্দ্ধন লিখিলেন

"দীনেশবাবু লাগিয়া থাকিলে স্কুলটি দাঁড়াইতে পারিবে—তখন অম্বিকার বেতন চালাইতে কোন কষ্ট হইবে না, কিন্তু দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিতে পারিব না।" অম্বিকাবাবু আমায় অনুনয়-বিনয় করিয়া অনেক কহিলেন, তার পর যখন দাদা মহাশয়ের প্ররোচনায় আমি আনন্দ বর্দ্ধন মহাশয়ের স্বাক্ষরের জন্ত জেদ করিতে লাগিলাম, তখন তিনি দু'একদিনের মধ্যে উহা আনিয়া দেবেন বলিয়া ভরসা দিলেন, —আনন্দবাবুর দস্তখতের আনিবার মেয়াদ আরও বাড়াইয়া লইলেন, কিন্তু শেষে বুঝিলাম—এ সম্বন্ধে কোন আশাই নাই।

প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ আমায় ধরিয়া বসিল, "সার—আমাদের বলুন, এ স্কুল হইতে আমরা এ বছর পরীক্ষা দিতে পারিব কি না ?"

সেইদিন আত্মীয় স্বজনের পীড়াপীড়িতে ঠিক করিলাম, শম্ভুনাথ স্কুল ছাড়িয়া দিব। তখন বেলা ১১টার সময় স্কুলে গেলাম। অম্বিকাবাবু পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সেদিন তিনি মনের দুঃখে স্কুলে আসিলেন না।

আমি ছাত্রগণকে বলিলাম "আমি অনেক চেষ্টা, অনেক লেখা লেখি করিয়া দেখিয়াছি। ইনেস্‌পেক্টার কিছুতেই স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত করিবেন না। সুতরাং তোমাদিগকে আমি আর মিথ্যা ভরসায় রাখিব না। আমি এই স্কুল ছাড়িয়া ভিক্টোরিয়া স্কুলের হেডমাষ্টারি গ্রহণ করা ঠিক করিয়াছি, এখন তোমরা যাহা ভাল বোঝ তাই কর।"

ছাত্রগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইল—অধিকাংশ ছাত্র বলিল, "আমরা ভিক্টোরিয়া স্কুলের বিদ্রোহী ছাত্র—কিন্তু আমাদের দর্প টিকিল না, আপনি যখন যাইতেছেন—তখন আমরাও আপনার সঙ্গে যাইব।"

আমি বলিলাম "আমার সঙ্গে তোমাদের যাওয়া ভাল হইবে না, এই

স্কুল আপনা হইতে নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ইহার ছাত্রমণ্ডলী লইয়া আমি প্রতিদ্বন্দী স্কুল গেলে—আমার পক্ষে শোভন হইবে না।"

তাহারা বলিল—"আপনি যান—আমরা যাহা উচিত বোধ করি, করিব।"

তখন আমি ধীরপদে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ের ন্যায় ভিক্টোরিয়া স্কুলের দিকে চলিলাম। অম্বিকাবাবুর কথা মনে করিয়া আমার মনে অত্যন্ত দ্বিধার ভাব হইতেছিল; তিনি তাঁহার স্কুলের ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য—প্রতিদ্বন্দী স্কুলের উপর জয়-পতাকা তুলিবার জন্য বড় আশা করিয়া আমাকে আনিয়াছিলেন; আমাকে রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন—আমি বৈষয়িকতার প্রলুব্ধ হইয়া তাঁহার পতনোন্মুখ ঘরখানি ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম। অন্তর হইতে আত্মাপুরুষ যেন ঘাড় নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, শরণাগতকে আশ্রয় দিবার জন্য কত লোক জীবন বিসর্জ্জন করিয়া থাকে, আর তুমি একান্ত বিপন্নব্যক্তিকে—তোমার নিয়োগকর্ত্তাকে একবারে বিপদের চূড়ান্ত সীমায় রাখিয়া—তাঁহার সনির্ব্বন্ধ বান্ধবতার মাথায় লগুড়াঘাত করিয়া চলিয়া আসিলে!" আমি শুষ্ক মুখে বিবেকের তাড়িত বক্ষের দ্রুত স্পন্দন শুনিতে শুনিতে ভিক্টোরিয়া স্কুলের গেটের নিকট উপস্থিত হইলাম, কিন্তু সবিস্ময়ে ও আতঙ্কিত চক্ষে দেখিলাম—শম্ভুনাথ ইনষ্টিটিউসনের প্রায় অধিকাংশ ছাত্র দলবদ্ধ হইয়া—আমা হইতে অনতিদীর্ঘ ব্যবধানে ধীরে ধীরে ও নিঃশব্দে আমাকে অনুগমন করিয়া আসিতেছে। ভিক্টোরিয়া স্কুলের ছাত্রেরা পূর্ব্বেই খবর পাইয়াছিল, আমি তাহাদের হেড মাষ্টার হইয়া আসিতেছি। আমাকে দূর হইতে দেখামাত্র তাহারা সকলে আমাকে অভিনন্দন করিবার জন্য স্কুল ঘর হইতে বাহির হইয়া যে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিয়াছিল—তাহা আমার এখনও মনে আছে। শম্ভুনাথ-প্রদত্ত তাঁবুতে কয়েকমাস শম্ভুনাথ স্কুল বসিয়াছিল

তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এজন্য ভিক্টোরিয়া স্কুলের ছাত্রেরা বিদ্রূপ করিয়া শম্ভুনাথ ইনিষ্টিটিউসনের নাম দিয়াছিল "তাম্বুনাথ ইনষ্টিটিউসন।" আজ আমাকে এবং আমার পশ্চাতে শম্ভুনাথ স্কুলের ছাত্রগণকে দেখিয়া তাহারা জয়ধ্বনি করিয়া বলিল "ভাগ্‌ লরে তাম্বুনাথ"। এই চীৎকার শুনিয়া শম্ভুনাথ স্কুলের ছাত্রগণ মাথা হেট করিয়া সজল চক্ষে এক মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইল; কিন্তু উপায়ন্তর না দেখিয়া ধীরে ধীরে ভিক্টোরিয়া স্কুলের মুক্ত তোরণ দিয়া স্কুলগৃহে প্রবেশ করিল। আমি এত ক্ষুব্ধ হইলাম— যে তাহা বলিতে পারি না। কেন যেন মনে হইল—আমি ভয়ানক অপরাধ করিয়াছি। আমার দাদা মহাশয়, শ্বশুর মহাশয় এবং অপরাপর আত্মীয়গণ সকলে একবাক্যে বলিলেন "বেশ করিয়াছ"। কিন্তু আমার অন্তরের অন্তরে যে বিচারক আছেন, তিনি অবিরত ঘাড় নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—"কাজ ভাল হইল না।" প্রায় একমাস কাল বিলুপ্ত শম্ভুনাথ ইনষ্টিটিউসনের স্মৃতি সিন্ধবাদের স্কন্ধাবলম্বী বুড়ের ন্যায় আমার উপর চাপিয়া রহিল। আমি দূর হইতে অম্বিকাবাবুকে দেখিলে নিতান্ত অপরাধীর ন্যায় পলাইয়া যাইতাম। দু'একবার কোন কোন স্থলে একথা শুনিয়াছি—"দীনেশবাবু, কি কাজটাই কর্‌লে—আরে, ছ্যাঃ এমন বিশ্বাসঘাতকতাও করিতে হয়!" একথার কোন জবাব না দিয়া আমি অতি ক্ষুব্ধ চিত্তে বাড়ীতে ফিরিয়া না খাইয়া মড়ার মতন পড়িয়া থাকিতাম।

ভিক্টোরিয়া স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া আমি কাজে বেশ সাফল্য দেখাইলাম। প্রথম বৎসরেই আমার স্কুল হইতে একজন কুড়ি টাকা স্কলারসিপ পাইল, পরে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হইল—সংস্কৃত ও ইংরেজীতে ও তাহার নম্বর খুব উঁচুতে উঠিয়াছিল। চট্টগ্রাম ডিভিসনে ইহার পূর্ব্বে কেহ কুড়ি টাকা বৃত্তি পায় নাই, ছেলেটির নাম ছিল "কাড়ু মিঞা"—সে একটী গরীব কৃষকের ছেলে ছিল, আমি তাহাকে স্কুল হইতে চার

টাকা মাসিক বৃত্তি দিয়া পড়াইয়াছিলাম। সে পরীক্ষাগুলি পাশ করিয়া "এস্‌কেন্দার আলি" নাম গ্রহণ করে, এবং ডিপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া শেষে পাগল হইয়া যায়।*

ইহার পরের বৎসরও আমাদের স্কুল হইতে একজন চাটগাঁ ডিভিসনে প্রথম হয়, এবং ছোটলাট ইলিয়েট সাহেব আমাদের স্কুল পরিদর্শন করিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া যান, যে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুল যখন এরূপ ভাল হইয়াছে,—তখন এখানে গভর্ণমেণ্ট স্কুল থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই।

গৃহের অশান্তি,—শোক, দুঃখ আমার উদ্যমকে দমিয়া দিতে পারে নাই। আমি অসংখ্য কবিতা লিখিয়াছিলাম। আমার একখানি কাব্য "কুমার ভূপেন্দ্র সিংহ" কুমিল্লার এক প্রেস হইতে বাহির হইল। যেদিন স্তূপাকৃতি করিয়া মুদ্রিত পুস্তকগুলি আমাদের বাহিরের ঘরে রাখিলাম,—সেই রাত্রিতে আগুন লাগিয়া প্রায় সমস্ত বই পুড়িয়া গেল, দুই চারি খানি বহুকষ্টে বাহির করিতে পারিয়াছিলাম। বোধ হয় একখানি আমার বাড়ী খুঁজিলে এখনও পাওয়া যাইতে পারে। "কুমার ভূপেন্দ্র সিংহ" কাব্যের ঘটনাটি এই—গিরিবর্ষের বৃদ্ধ রাজা যুবরাজ ভূপেন্দ্র সিংহকে একটি মর্ম্মর প্রস্তরের নির্ম্মিত রমণী মূর্ত্তির প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি কোন দৈব-বলে জানিতে পারিয়াছিলেন, ঐ মূর্ত্তির মত রমণী দ্বারাই তাঁহার রাজত্বের ধ্বংস সাধন হওয়ার সম্ভব। যুবরাজ যদি তদ্রূপ কোন রমণী দর্শন করেন, তাঁহাকে যেন স্পর্শ না করেন; স্পর্শ করিলে অচিরে রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। কুমার ঘটনাক্রমে সেইরূপ রমণীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার প্রেমাসক্ত হইয়া পড়েন—উক্ত রমণী এক রাজকুমারী। যুবরাজকে দর্শনমাত্র তিনিও তাহার অনুরক্ত হন। যুবরাজ একদিকে

ঐকান্তিকী রূপ-পিপাসা, অন্যদিকে মৃত রাজার নিদারুণ অনুজ্ঞা—এই দুই বিরুদ্ধভাবের মধ্যে পড়িয়া সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপস্থিত হন। বহুদিন মনের সহিত সংগ্রাম করিয়া তিনি একদিন মোহান্ধ হইয়া নিদ্রিতা রূপসীর কপোলে একটি মাত্র চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দেন। সেই ঘটনার অল্প সময় পরে সংযমন সিংহ নামক শত্রু কর্তৃক রাজ্য আক্রান্ত হয়। কুমার ভূপেন্দ্র একবার এই শত্রুকে দ্বন্দযুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন—কিন্তু তিনি বলবিক্রমশালী হইলেও এবার বিমূঢ় ও ভয়বিহ্বল হইয়া রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া যাইবার চেষ্টায় এক কূপোদকে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করেন।

কুমার সেই রূপসী ললনাকে দূরে রাখিতে বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নিয়তি বারংবার তাঁহাকে কুমারের সম্মুখে উপস্থিত করিল। অবশেষে জুলিয়া যেরূপ ডনজুয়ানকে সামনে রাখিয়া নিজ হৃদয়ের বল পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিল, কুমারও সেইরূপ তাঁহার হৃদয়রাণীকে স্বীয় প্রাসাদের সংলগ্ন এক গৃহে রাখিয়া দূর হইতে প্রাণের পিপাসা মিটাইতে চাহিতেন; কিন্তু হৃদয় লইয়া এই লুকাচুরি বেশী দিন চলিল না, একদিন সত্য সত্যই তিনি নিয়তির বশবর্ত্তী হইয়া পরীক্ষায় হার মানিলেন। সেই রাত্রির বর্ণনাটা তুলিব :—

(১)

"আকাশে ফুটেছে তারা রাশি রাশি।
মধ্য নভে চন্দ্র যায় হাসি হাসি॥
সাদা সাদা যথা যুথিকা-সুন্দর।
ফুটিয়াছে জ্যোৎস্না ধরার উপর॥
মধুর সে আলো পড়েছে কাননে।
ফুল কলিকার সলজ্জ বদনে॥
গোলাপের মুখে বল্লরীর গায়।
গবাক্ষে পড়িয়া চুমিছে কেশায়॥

সুপ্ত সুন্দরীর ঘুমন্ত অধরে।
ফুটেছে সে জ্যোৎস্না নীলিম অম্বরে॥

(২)

সেই জ্যোৎস্না মাঝে একাকী কুমার।
ভ্রমিছে নীরবে, পৃষ্ঠদেশে তাঁর॥
ধনু সহ শর ঝুলিছে হেলায়।
শিরোরত্ন হ'তে মণি উজলায়॥
ভ্রমিছে কুমার ব্যথিত হৃদয়।
চিত্তের উদ্বেগ নাহি শান্ত হয়॥
কভু দেখে চন্দ্র জ্বলে ঊর্দ্ধে দূরে।
কভু দেখে সেই স্তব্ধ রাজ পুরে॥
জ্বলিছে দেউটী, নিভিছে দেউটী।
প্রহরীর স্বর মিশে নভে উঠি॥

(৩)

চিত্ত ভার তার লাঘব না হয়।
উথিয় কুমার ব্যথিত হৃদয়॥
সতেজ জ্বলন্ত যেন হুতাশন।
ভালবাসা তার দহিতেছে মন॥
পশিল যুবক চিন্তিত হৃদয়ে।
রাজপুরী পার্শ্বে ত্রিতল আলয়ে॥
করাঘাতে মুক্ত হল গৃহ দ্বার।
সম্ভ্রমে প্রহরী করে নমস্কার॥
পশিল ভূপেন্দ্র অট্টালিকা শিরে।
সুদীর্ঘ সোপান শ্রেণী ভাঙ্গি ধীরে॥
ছাদ লয় গৃহ, খুলি ধীরে দ্বার।
পশিয়া দেখিল বিস্ময়ে কুমার॥

(৪)

শুভ্র ফেন-নিভ শয্যায় পড়িয়া।
সুষুপ্তা সুন্দরী রয়েছে লুটিয়া॥
রমণীয় তপ্ত কাঞ্চন-বরণে।
পড়েছে জোছনা, সুন্দর বদনে॥
ঘেরি চুল জাল রয়েছে জড়িয়ে।
ধীরে বাত-শিশু খেলে তা লইয়ে॥
ছিন্ন ভিন্ন যথা ফুল হায় হায়।
শৈবালে কমল জড়িত হেলায়
স্তূপে স্তূপে ফুল্ল ফুল যাপি পাত।
ঘুমে ভুজবল্লী যেন অসংযত॥
এমন সুন্দর এমন কোমল।
নবনীতে যেন গাঁথা ফুল দল॥

এর পরে স্পর্শ হইতে আটকাইল না। তারপর অনেক অঘটন ঘটিল। বহু কষ্টের পর কুমার মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন—তাহা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি—

উপসংহার ভাগ এইরূপ :—

(১)

"কিন্তু এখন (ও) জনশ্রুতি আছে,
সন্ধ্যার আঁধারে বন-তরু কাছে,
কৃষ্ণ হয়ারূঢ় যুবক মুরতি।
কুপিত নয়নে জলে উগ্র দ্যুতি॥
রুক্ষ শির-কেশ অসংলগ্ন বেশে।
রাজপুত্র লয়ে ছুটে অশ্ব ক্লেশে॥

চমকি গৃহস্থ জাগি দেখে বীরে।
অশ্বের উপরে দূর তরুশিরে ॥
খেলিয়া ফিরিতে গৃহেতে সন্ধ্যায়।
শিশুপথে তাহা দেখি ভয় পায় ॥
প্রহরী একাকী নৈশ অন্ধকারে।
রাজপথে তারে সভয়ে নেহারে ॥

(২)

যুবা অশ্বারোহী সুন্দর বদন।
বিষাদ-ব্যঞ্জক সুতীক্ষ্ণ নয়ন।
ছুটিতেছে জ্যোতিঃ নিরাশ শোকেতে।
গিরিবর্ত্ম রাজ্য হেরিছে কোপেতে ॥
কভু পথ ভুলে ভ্রমিয়া পথিক।
শুনে দূর বনে আহ্বানে সৈনিক ॥
কূপোদক হ'তে সে তীব্র চীৎকার
ভেদে বায়ুস্তর, নৈশ অন্ধকার।
এখন (ও) সে বনে চলেনা পথিক।
সশস্ত্র তথাপি শিহরে সৈনিক ॥
শীতরাত্রে শিশু আগুন ঘিরিয়া
শিহরে ভয়ের কাহিনী শুনিয়া ॥"

কুমার ভূপেন্দ্র সিংহ আমার ১৯ বৎসর বয়সের লেখা। ১৮৮৬ সনে পুস্তকখানি রচিত হইয়াছিল। ইহার ২।৩ বৎসর পরে ছাপা হইয়া অগ্নিদাহে অধিকাংশ পুস্তক বিনষ্ট হইয়া যায়।

এইভাবে আমার গৃহ-ভারতীর অগ্নি-পরীক্ষা হইয়া গেল। আরও এক কারণে দেবীর বেদী, কবিত্বের শতদল, আমার বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা

পাইতে পারিল না। সে কথা লিখিবার পূর্ব্বে আমার ১৯ বৎসর বয়সের লেখা একটা ব্যঙ্গ-কবিতা, যাহা একটা খাতায় কত কাটা ছিল—তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিব।

পশুপতি ন্যায়রত্ন।

(১)

ন্যায়রত্ন মহাশয় নিমন্ত্রণ খেয়ে,
উদর করিয়া স্ফীত, গিন্নি কাছে ঘেঁসে
হুকা হাতে উপবিষ্ট। ধোঁয়া ঘর ছেয়ে
উড়িতেছে, মরি যথা সুন্দরীর কেশে
বেণীর লহরী, কিংবা বাষ্পযান সাথে
চলে যথা ধূমপুঞ্জ, গিন্নি ভুগি রোগে
সবে উঠেছেন মাত্র, পাখা ক্ষীণ হাতে।
এদিকে একান্ত মনে থড়িকা সংযোগে
দন্ত লগ্ন পর্ণ অংশ করি নিস্কাশন,
ন্যায়রত্ন করিছেন ধীরে রোমন্থন।

(২)

কথা নাই কোন পক্ষ, প্রকৃতি পুরুষ
পাশা পাশি, কথা নাই, কোন কার্য্য নাই!
ন্যায়রত্ন অতিরিক্ত ভোজনে বেহুস
গিন্নি দূর গত পুত্র, ভাবিছেন তাই।
হেনকালে স্বপ্নভঙ্গ করি উভয়ের।
উপস্থিত হইলাম সম্মুখে তাঁদের॥

(৩)

বলিলেন ন্যায়রত্ন,—"এস পুরন্দর
বহুদিন দেখি নাই"—হামাগুড়ি দিয়া
শয্যার একটি ভাগ করি অবসর,—
বসিতে কহিলা মোরে,—আমিও সরিয়া
একধারে বসি দেখি পণ্ডিতের পাছে।
উড্ডীন টিকিটি দ্রুত বায়ুভরে নাচে।

(৪)

বলিলাম "মহাশয় কয়টি গভীর
আধ্যাত্মিক প্রশ্ন মনে হয়েছে উদয়।
মীমাংসা তাহার চাই,—প্রভুর শরীর
ভাল তো এখন?—কিছু হতেছে সংশয়।"
হাই তুলি তুড়ি মারি বলিলেন প্রভু
"ব'লে যাও ইতস্ততঃ করিও না কভু।"

(৫)

"ধর্ম্ম কি?" শুধানু যবে,—বাঁকা করি আঁখি
চাহি মোর প্রতি ন্যায়রত্ন মহাশয়
বলিলেন—"শুন বৎস কহি ধর্ম্ম কি,
প্রশ্নের উত্তর গুলি অতি সূক্ষ্ম হয়।
সলিলের ধর্ম্ম এই সিক্ত করে দেহ।
আগুনের ধর্ম্ম পুড়ে যাহা কিছু ধরে।
মৎস্যের সাঁতার ধর্ম্ম, মার ধর্ম্ম স্নেহ।
জীবের—প্রকৃতি-ধর্ম্ম জন্মে আর মরে।"

আমার শত শত কাব্যের পাণ্ডুলিপি, যাহা কুমিল্লা ছাড়িবার সময় আমি একটা বৃহৎ সিন্দুকে রাখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা আমার প্রতিবাসী

বিশ্বেশ্বর গাঙ্গুলী মহাশয়ের পুত্র আমার অজ্ঞাতসারে লইয়া গিয়াছেন, শুনিয়াছি তিনি বঙ্গদেশের ত্রিসীমা পার হইয়া ব্রহ্মদেশে কোন কর্ম্ম করিতেছেন। আমি কিছুতেই তাহা হস্তগত করিতে পারিলাম না। তাহা ছাপা হইলে আধখানা ওয়েবেষ্টারের তুল্য আয়তনের হইত। শৈশব ও কৈশোরে যাহা কিছু লিখিয়াছিলাম—সাহিত্য-হিসাবে হয়ত তাহার কোন মূল্যই নাই—কিন্তু আমার বহু আরাধনার জিনিষ গুলি আমার প্রিয় ছিল। আমার নিত্যকার সুখদুঃখ বিজড়িত সেই খাতা গুলি দেখিবার জন্ত বড়ই ইচ্ছা হয়। বড়ই দুঃখের বিষয় যে কোথা হইতে কে আসিয়া আমার ভারতীয় সেবার পথে এইরূপ বিঘ্ন উপস্থিত করিল।

ইংরেজী সাহিত্যের একখানি ইতিহাস—ভারতীয় আদর্শের মাপ-কাটিতে বিচার করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে সুরু করিব, এই সংকল্প করিতেছিলাম। এমন সময় কলিকাতার পিস্ এসোসিয়েসনের নোটিস পড়িলাম, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' সম্বন্ধে গবেষণা-মূলক সর্ব্বোত্তম প্রবন্ধের পুরস্কার একটি রৌপ্য পদক দেওয়া হইবে। প্রবন্ধের বিচারক হইবেন—চন্দ্রনাথ বসু ও রজনীকান্ত গুপ্ত।

আমি বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য লইয়া এতদিন ঘাটাঘাটি করিতেছিলাম, সুতরাং এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে সহজেই প্রবৃত্ত হইলাম। এই সময় আমি নবজীবন, জন্মভূমি, অনুসন্ধান প্রভৃতি পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন 'দাসী' নামক এক পত্রিকা প্রকাশিত করেন, আমি তাহার রীতিমত লেখক ছিলাম। আমার প্রবন্ধের সর্ব্বত্রই আদর হইতেছিল। এমন কি জন্মভূমি পত্রিকার সম্পাদক আমার প্রবন্ধ গুলির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া অযাচিত ভাবে কয়েকবার টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বাহিরের পাঠকদের মধ্যেও অনেকে প্রশংসা করিয়া চিঠি লিখিতেন—

অনুসন্ধানে আমার "জন্মান্তর বাদ" নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, কবি হেমচন্দ্রের ভ্রাতা সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত ঈশানচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদককে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আমার অজস্র প্রশংসাবাদ ছিল, সে প্রবন্ধের নীচে আমার নাম ছিল না। পিস্ এসোসিয়েসন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধই পুরস্কার যোগ্য মনে করিয়াছিলেন।

এই প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গেই আমি ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস লিখিতে সুরু করিয়াছিলাম। কুমিল্লায় হাকিমদের মধ্যে আমার অনেক বন্ধু জুটিয়াছিল, তন্মধ্যে স্বর্গীয় ষ্টাটুটিয়ারী সিভিলিয়ান সুকবি বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের নাম সসম্মানে উল্লেখ-যোগ্য। তিনি তখন মেঘ-দূতের পদ্যানুবাদ করিতেছিলেন। তিনি কুমিল্লায় একটি সাহিত্য-সমিতি গঠন করেন, আমি তাহার সম্পাদক হইয়াছিলাম। বরদাচরণ মিত্র মহাশয় সুদীর্ঘদেহ, গৌরবর্ণ ছিলেন; তাঁহার সুবৃহৎ চক্ষে, তিলফুলের মত সুগঠিত নাসিকায় ও উজ্জ্বল কপোল হইতে যেন প্রতিভা ফুটিয়া বাহির হইত; তিনি অতি সুপুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার হাতের আঙ্গুলগুলি জন্মাবধি পরস্পর সংলিপ্ত ছিল ও সেগুলি পূর্ণ-গঠিত ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই হাত লইয়া তিনি এত দ্রুতভাবে লিখিয়া যাইতেন, যেন মুক্তাহারের সৃষ্টি করিয়া যাইতেন। কি ইংরাজী, কি বাঙ্গলায় তাঁহার মত ক্ষিপ্র কবিত্বময়ও ওজস্বী ভাষায় লিখিতে আমি অল্প লোককেই দেখিয়াছি। 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকায় বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার একটি সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ভাষা এরূপ ওজস্বী, রচনা এরূপ সূক্ষ্ম বিশ্লেষণময়ী—এবং ইংরেজী এরূপ বিশুদ্ধ, যে রমেশ দত্ত মহাশয়ের বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে পুস্তক পাঠ করিয়া যে ধারণা হয়, এই অপেক্ষাকৃত অতি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাহা হইতে

অনেক বেশী জ্ঞান জন্মে। ইনি ঠিক সাহেবের চাল-চলনে থাকিতেন। যত জজ ম্যাজিষ্ট্রেট আসিতেন, সকলের অপেক্ষা তিনি পাণ্ডিত্য, কর্মঠতায় এমন কি ইংরেজী ভাষার জ্ঞানেও উৎকৃষ্ট ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা—এমন কি ভয় করিতেন। সাহেবী কায়দা এতটা চালাইতেন যে সবজজগণ কার্ড দিয়া বসিয়া থাকিতেন,—অবসর ক্রমে অল্প সময়ের জন্য দেখা করিতেন,—এবং তাঁহাদের সঙ্গে আদৌ মিশিতেন না। কিন্তু সাহিত্যিক বন্ধু পাইলে যেন তাঁহার গোচারণের মাঠ মনে পড়িত। রাজ বেশ—রাজ-ভাষা ভুলিয়া যাইতেন, এবং অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত মেলামেশা করিতেন।

এই "মিত্র-সাহেবে"র আরও অনেক মূর্ত্তি আমি দেখিয়াছি। শারদীয় পূজোপলক্ষে কুমারটুলির বাড়ীতে তিনি যখন দুর্গা প্রতিমার সম্মুখে—পিতা বেণীমাধব বাবুর পদপ্রান্তে গরদের উত্তরীয় গলায় পরিয়া নগ্নদেহে বসিয়া শ্লোক পড়িতেন, তাঁহার রচিত "জগদ্ধাত্রী" ও "মানুষ মেষ" কবিতা আবৃত্তি করিতেন—তখন তাঁহার গম্ভীর ও ওজস্বী কণ্ঠের আবৃত্তির ঝঙ্কারে পূজা মণ্ডপ কাঁপিয়া উঠিত,—সেরূপ ভক্তির উচ্ছ্বাস, কবিত্ব ও প্রবাসে সাহেবী কায়দা—এই দুই বিরুদ্ধ ভাবের সমন্বয় আমি কিছুতেই করিতে পারিতাম না। আমি যখন অতি দুঃসময়ে পড়িয়া পীড়িত ও নিঃসম্বল অবস্থায় তাঁহার নিকট আমার করুণকাহিনী বলিয়াছিলাম, তখন ঝর ঝর করিয়া তাঁহার চক্ষু হইতে জল পড়িয়াছিল—তাঁহার দয়া সেই অশ্রুতেই পর্য্যবসিত হইয়া যায় নাই। তিনি যে জেলায় গিয়াছেন, সেই জেলা হইতেই আমার জন্য মাসে মাসে দুই তিন শত টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত আমাদের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

এরূপ পিতৃ-ভক্ত লোকও আমার চক্ষে বড় পড়ে নাই। বেণীবাবুর নিকট এই প্রৌঢ়বয়স্ক পুত্র—একটি অপগণ্ড শিশুর মত দেখাইত; এত

বড় পণ্ডিত, এত বড় সাহেব—শিষ্যের মতন কৌতূহলের সহিত পিতার নিকট আধ্যাত্মিক নানা প্রশ্ন করিতেন,—এবং প্রতিটি উত্তর মানিয়া নেওয়ায় যেন গর্ব্ব বোধ করিতেন; শিশুর ন্যায় পিতার নিকট আবদার করিতেন, এবং পিতার কথা কখনই লঙ্ঘন করিতেন না। বরদাবাবুর মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয় এবং একটি প্রতিভাবান তরুণ পুত্র, তাঁহার মৃত্যুর চার পাঁচ দিন পূর্ব্বে অকালে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যায়। কিন্তু বোধ হয় পুত্র শোকাপেক্ষা ও পিতৃশোকই তাহাকে বেশী বিহ্বল করিয়াছিল। আমি বরদাচরণের মৃত্যুর তিনদিন পূর্ব্বে কুমার-টুলীর বাড়ীতে তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। ভ্রমক্রমে আমি তাঁহাকে বলিলাম "বোধ হয় আপনার পিতার শোকটা আপনাকে বড্ড লাগিয়াছে" —এই কথার কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার দুই চক্ষু হইতে অজস্র জল পড়িতেছে ও কথা বলিবার চেষ্টায় কণ্ঠ-রোধ হইয়া আসিতেছে। তাঁহার পীড়ার তখন উৎকট অবস্থা, আমি অত্যন্ত ভীত ও অনুতপ্ত হইয়া অন্য কথা পাড়িতে লাগিলাম, কিন্তু তাঁহার সেই শোক কিছুতেই প্রশমিত হইল না। আমি বুকে হাত বুলাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম,—তাঁহার পিতার প্রায় ৯২ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। এরূপ পিতৃ-স্নেহ—হিন্দুর ঘরেও আমি খুব অল্পই দেখিয়াছি।

আমার কুমিল্লার আর এক সঙ্গী ছিলেন ডিপুটি রসিকলাল সেন, বিটসন বেল সাহেব ইঁহার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া একবার ইঁহার বাহমূলে সন্ধির অস্থিটির স্থান বদলাইয়া দিয়াছিলেন। ইনি ইংরেজী ভাষায় কৃতবিদ্য ছিলেন, এবং সাহিত্যিক ব্যাপারেও ইঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও পাণ্ডিত্য ছিল। আমি রাতদিন ইঁহার সঙ্গে থাকিতাম। কিন্তু সকলের চাইতে ডিপুটি ছিলেন, আমার খুল্লতাত কালীশঙ্কর সেন; লম্বায় ইনি ছিলেন

সাত ফিট,—বর্ণ ছিল—গাঢ় কৃষ্ণ, বাঙ্গালা দেশে এত কালো রং বড় দেখা যায় না। ঠোট দুখানি ছিল পুরু। বোধ হয় নীল নদের তীরে জন্মিলেই ঠিক্ হইত, যেন পথ ভুলিয়া বঙ্গদেশে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু চক্ষু দুটি ক্ষুদ্র হইলেও জ্যোতিষ্মান ছিল। সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ইনি প্রতিদিন ডিঙ্গাইয়া চলিতেন, এবং এরূপ যদৃচ্ছাক্রমে জীবন চালাইতেন—তিনি পরের হাঁটাপথে চলিবেন না, এই সংকল্প করিয়াই যেন জীবনযাত্রা সুরু করিয়াছিলেন। ব্যাভিচার গুলি তাঁর এত মৌলিক ছিল—যে তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। আমি দুই একজন অশতিপর বৃদ্ধ মোক্তারকে ইহার খাসকামড়ায় মাজা দোলাইয়া খেম্‌টা নাচ নাচিতে দেখিয়াছি। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িয়া ইনি পড়া সাঙ্গ করেন এবং শুধু কপালের লেখা ও দৈববলে ডিপুটিগিরি লাভ করেন। যদিও ইংরেজী খুব ভাল লিখিতে পারিতেন না এবং বড় বড় রিপোর্ট গুলি আমি ও রসিকবাবু মাঝে মাঝে লিখিয়া দিতাম, তথাপি ঐ রিপোর্টে যদি কোন অসঙ্গতি থাকিত, তাহা তাঁহার চক্ষে অমনই ধরা পড়িত। তিনি নিজ হাতে না লিখিলেও রিপোর্টটি যে পর্য্যন্ত মনের মতন না হইত, সে পর্য্যন্ত লেখক অব্যাহতি পাইতেন না। সেই সকল রিপোর্টের কৃতিত্ব ও সর্ব্বাংশে তাঁহারই থাকিত, এমন কি রিপোর্টের ভাষার অসঙ্গতি পর্য্যন্ত তাঁহার কাণে এড়াইত না। তিনি নির্ভীক ও একান্ত উদার প্রকৃতি ছিলেন। সাত দিনের মধ্যে মাহিয়ানার ৮০০ শত টাকা ফুরাইয়া ধার করিতে বসিতেন। তাঁহার মনস্বিতা এত তীক্ষ্ণ ছিল, যে তিনি যে কাজ উৎরাইতে পারিতেন, এরূপ আর কোন ডিপুটির সাধ্য ছিল না, এজন্য কটন প্রভৃতি বড় বড় সিভিলিয়ানেরা তাঁহার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। নিজের কৃষ্ণবর্ণ ও বিরূপ চেহারা লইয়া যে তিনি নিজেই কত ব্যঙ্গ করিতেন, তাহা আর কি লিখিব? একদিন আমায় বলিলেন "দীনেশ! আমি যে

কত কালো তা তোরা বুঝিস্ নাই, আমি আজ বুঝেছি। আজ জজ-সাহেবের মেম আমায় পথে বলিলেন "মিষ্টার সেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমাদের বাসাবাড়ীর কাছ দিয়া তুমি যাবে কি?" আমি অতিশয় ভদ্রতা করিয়া তাঁহাকে আমার গাড়ীতে তুলিয়া লইলাম। তাঁহার হাত দুখানির ঠিক পাশেই আমার হাত খানি ছিল, আমার মনে হইল খুব সাদা কাগজটার এক প্রান্তে যেন কে কতকটা কালী ঢালিয়া ফেলিয়াছে— আমি যে এত কালো, মেম সাহেবের হাতের কাছে আমার হাত না থাকিলে তাহা বুঝিতেই পারিতাম না।"

সন্ধ্যাকালে কুমিল্লায় আমরা একটা আড্ডা দিতাম। কালীশঙ্কর বাবু, রসিববাবু, প্রসন্নগুপ্ত ও সত্যবাবু মুন্সেফদ্বয়, গোপালবসু সবজজ, নগেনদত্ত ডিপুটি, কান্তিবাবু ইন্‌স্পেক্টর,হেমেন্দ্র খাস্তাগির ডিপুটী প্রভৃতি এই আড্ডার রীতিমত সদস্য ছিলেন। গোপাল বসু ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন, concatination, troglydyte প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কথায় তাঁহার বক্তৃতা চলিত, তিনি অভিধানের সাহায্য চিঠি লিখিতেন, অভিধানের সাহায্যে কথা বলিতেন, অভিধানের সাহায্য ব্যতীত তাহার অর্থ স্ফুট করে, কাহার সাধ্য? কৃষ্ণনগর রাজবংশের ডিপুটি ক্ষেত্র গোপাল রায় হারমোনিয়াম বাজাইয়া "বাশী বাজাও না শ্যাম" গান ধরিতেন ও প্রসন্নগুপ্ত মুন্সেফ নানারূপ বিদ্রূপ ও হাসি ঠাট্টায় আড্ডাটা মুখরিত করিয়া ফেলিতেন। আমাদের বিদ্রূপ প্রায়ই কলেকটরীর সেরেস্তাদার চন্দ্রকুমার বাবু ও তাঁহাদের থিউসপির দলের উপর প্রযুক্ত হইত। আমরা রহস্য করিয়া ভোট লইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিতাম। পুলিস ইনস্পেক্টর কান্তিবাবু চোর ধরার জন্য একবার বাটী চালান দিয়াছিলেন। কালী-শঙ্কর বাবু বলিলেন, "শোন কান্তি, আমরা হচ্ছি ঘটিরাম ডিপুটী, তুমি

হচ্ছে বাটিরাম ইনস্পেক্টর।" ইহার কিছু পরে প্রকাশচন্দ্র সিংহ ও তাঁহার ভ্রাতা সুরেশচন্দ্র সিংহ। (রায় বাহাদুর) এবং মিঃ এ, কে, রায় ডিপুটি হইয়া কুমিল্লায় আসিলেন। বাঙ্গলা কথার মধ্যে ইংরেজী বুকুনি দিলে প্রতিটী কথায় এক টাকা জরিমানা দেওয়ার করার করিয়া আমরা অনেক কৌতুক ও আমোদের সৃষ্টি করিয়াছি।

ইহার মধ্যে ডিক্রুজ নামক একজন টেলিগ্রাফ মাষ্টার আসিয়া জুটিল। সে ফিরিঙ্গী হইলেও খাঁটী ইংরেজের মত তাহার চেহারা ছিল, তাহার ছোট ছোট দুই তিনটি সন্তান ছিল, একজন ছিল চার্লি' (Charles)। মেয়েটীর নাম ছিল 'ম্যাগি' (Margret); এই হতভাগ্যের স্ত্রী বাঁচিয়া ছিলেন না। ডিক্রুজ দিনরাত আমার কাছে পড়িয়া থাকিত। শেষে বাজারে বেড়াইতে যাইয়া "গোলাপী" নাম্নী এক গণিকার কুহকে পড়িয়া সে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়। ছেলে মেয়ে যে কি কষ্ট পাইত, তাহা আর কি লিখিব? তাহাকে তাহার সাহেব সমাজ ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করে। আমি তাহাকে ফিরাইতে অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলাম, কিন্তু গোলাপী তাহাকে ভেড়া বানাইয়া ফেলিয়াছিল। সাহেবেরা চক্রান্ত করিয়া উপরে চিঠিলিখিয়া তাঁহাকে বদলী করাইলেন—একবারে পঞ্জাবে। গোলাপী বুঝিয়াছিল,এর হাতে আর কপর্দ্দকও নাই। তখন সাহেব তাহার পায়ের উপর একদিন একরাত্রি পড়িয়াছিল কিন্তু কিছুতেই সে বাঙ্গালা-দেশ ছাড়িয়া পঞ্জাবে যাইতে স্বীকৃত হইল না। যে দিন যাইবে, সে দিন অপরাহ্ণে আমাকে একটা নির্জ্জন জায়গায় গিয়া সে যে কি কান্নাটা কাঁদিয়াছিল—কত আক্ষেপ করিয়াছিল, তাহা আমি ভুলি নাই। স্ত্রীলোকের কুহকে যে মানুষ কতটা বিড়ম্বিত হইতে পারে, ডিক্রুজ—গোলাপী অধ্যায় আমার নিকট তাহার জীবন্ত প্রমাণ হইয়া আছে।

একদিন আমি বাড়ীতে বসিয়া আছি, এমন সময় আমার প্রতিবাসী বন্ধু প্রকাশচন্দ্র সিংহ ডিপুটী মহাশয় তাঁহার আত্মীয় কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয়কে লইয়া আমার আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। খর্ব্বাকৃতি শ্যামবর্ণ,—রোগা চেহারা, লক্ষ্য করিবার মধ্যে বড় দুটী উজ্জ্বল চক্ষু এবং হাসির ছটায় মধুর ঠোঁট দুখানি। কৈলাস বাবু ঐতিহাসিক বলিয়া তখন সর্ব্বত্র পরিচিত, তখন তিনি 'রাজমালা' নামধেয় ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত লিখিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপটা খুব জমিয়া গেল। প্রকাশবাবু বদলি হইয়া গেলেন. তখন হইতে কৈলাসবাবু কুমিল্লায় আসিয়া আমার বাড়ীতেই থাকিতেন। তখন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের বিরুদ্ধে ভয়ানক একটা দল বাঁধিয়া উঠিয়াছিল, কৈলাসবাবু সেই দলের একজন একজন নেতা হইয়াছিলেন। ত্রিপুরারাজ্যের অনেক কেলেঙ্কারীর কথা কৈলাসবাবু তাঁহার ইতিহাসে স্থান দিয়াছিলেন; আমি তাঁহাকে এক পক্ষের ওকালতি করিয়া অপরপক্ষকে নিতান্ত হীনভাবে চিত্রিত করার পক্ষে উৎসাহ দিতাম না, কিন্তু তিনি এবং তাঁহার দলের লোকের বলিলেন "সত্যের অনুরোধে এ সকল লিখিতে হয়।" আমি বলিলাম "পৃথিবীর যত কেলেঙ্কারী ও নিন্দাবাদ—তা' তো সত্যের অনুরোধে বলা হয় বলিয়াই নিন্দাবাদীরা প্রচার করিয়া থাকেন, লোকে যে রাগে অন্ধ হইয়া গালি দিতে থাকে, তাহা তলাইয়া দেখিলে অনেক সময় সত্যকে অতিক্রম করে না। পরের গ্লানি করা সত্যের ধুয়ো ধরিলে ও সমর্থনযোগ্য নহে। যেহেতু মনু একথা বলেন নাই যে সত্য অপ্রিয় হইলে সে কথা বলিতে হইবে।"

কৈলাসবাবু আমার বঙ্গভাষার প্রতি অনুরাগ ও মৌলিক চেষ্টা দেখিয়া সুখী হইলেন, যেহেতু আমি তখন সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা পুঁথি সংগ্রহ কার্য্যে অনুরাগী হইয়াছিলাম। আমাদের হেড পণ্ডিত চন্দ্রকুমার

কাব্যতীর্থ আমাদের বাড়ীর এই গৃহটির ক্ষুদ্র তর্কবিতর্কে আসিয়া যোগ দিতেন। আমি দিনের পর দিন কেবলই চণ্ডীদাস ও কবিকঙ্কণের কবিত্ব বিশ্লেষণ করিয়া যাইতাম, মনে হইত—তাঁহারা আমার ব্যাখ্যায় খুব প্রীত হইতেন। আমি অনেক সময় চণ্ডীদাসের কবিতা ইহাঁদিগকে পড়িয়া শুনাইয়াছি।

এই কবির বর্ণিত রাধা এবং বিদ্যাপতির রাধা—দুইটি ভিন্ন সামগ্রী। একজন সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের ভাণ্ডার হইতে সাজসজ্জা, আনিয়াছেন—অপরা বঙ্গদেশের ভক্তি ও ভাব-সম্পদের মূর্ত্তি। একজনের অপাঙ্গদৃষ্টী, যৌবনোদ্গম, রহস্য প্রিয়তা, এমন কি অব্যক্ত অস্ফুট কোরকের ন্যায় অধরপ্রান্তের হাসিটুকু ও অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মানুবায়ী—সামান্য নায়িকার লক্ষণাক্রান্ত। অপরার বসনাঞ্চল ধূলায় লুণ্ঠন-শীল, তাঁহার নায়কের মনচোরা অপাঙ্গ দৃষ্টি নাই, ধ্যানশীলার ন্যায় মুগ্ধ ঊর্দ্ধ দৃষ্টি। তিনি সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া প্রেমের আবেশ দেখাইতেছেন, "বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, ভূষণ খসিয়া পড়ে।" তিনি আবদ্ধ বেণী মুক্ত করিয়া চম্পকমালা খসাইয়া ফেলিয়া—স্বীয় কুন্তলদামের কৃষ্ণ শোভা নিরীক্ষণ করেন। ময়ুর ময়ূরীরকণ্ঠে সেই কৃষ্ণোজ্জ্বল স্নিগ্ধ বর্ণ, মেঘে ও সেই কৃষ্ণবর্ণ—আর, তাঁহার এলাইত কৃষ্ণ কুন্তলেও তাহাই, সুতরাং নিজদেহে এবং বাহিরে তিনি কৃষ্ণকে খুঁজিয়া আবিষ্কার করিয়া ধ্যানশীলা।

এই ধ্যানের রূপ আর কোনও কবির কাব্যে নাই—ইহা গৌরাঙ্গ প্রভুর পূর্ব্বাভাস; চৈতন্য যদি স্ত্রীলোক হইতেন, তবে চণ্ডীদাস বর্ণিত এই রাধার অনুরূপা হইতেন।

"ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আসে যায়।

মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন,
কদম্ব-কাননে চায়।"

চণ্ডীদাস রাধার এই বিভ্রান্তরূপ আঁকিয়াছেন; তারপর গৌরাঙ্গের রূপ ধ্যানে লাভ করিয়া রাধামোহন ঠাকুর লিখিয়াছেন :—

"আজু হাম কি পেখিনু নবদ্বীপ চন্দ
করতলে করই বয়ান অবলম্ব।
পুনঃ পুনঃ গতা-গতি করু ঘর-পন্থ
ক্ষণে ক্ষণে ফুলবনে চলই একান্ত॥
ছল ছল নয়নে কমল সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ।"

বঙ্গদেশের প্রেমের বইএর এক পিঠে রাধা, আর এক পিঠে গৌরাঙ্গ। একজন প্রেমসাধনা-দীপ্ত কল্পনায় দৃষ্ট মানসী প্রতিমা, আর একজন সহস্র ভক্তকণ্ঠের জয় জয় শব্দে অভিনন্দিত, খোল-করতাল-সংগীত-বন্দিত ঐতিহাসিক চিত্র। সাধনা-রাজ্যের এইখানি দুই চিত্রপট। যে ব্যক্তি শতদলকে লক্ষ্য না করিয়া তাহার নীচের পাঁক দেখিয়া ফিরিয়া যায়, সে নিতান্তই হতভাগ্য; তাহার আলোচনার মসীতে সে নিজে কলঙ্কিত হয় মাত্র; কিন্তু পদ্মের নিশ্বাস-সুরভি তাহার ভাগ্যে লাভ হয় না।

চণ্ডীদাস কৃষ্ণের প্রেম বর্ণন করিতে যাইয়া পর পর কতকগুলি ছবি দিয়া গিয়াছেন। প্রথম চিত্রে, কিশোরী বিদ্যুতের মত চাহনি ফেলিয়া চলিয়া গেল, "নবীন কিশোরী, মেঘের বিজুরী, চমকি চাহিয়া গেল" বিদ্যাপতি এই পদের উপসংহারে লিখিয়াছেন—"মেঘমালা সঙে তড়িতলতা জনু, হৃদয়ে শেল দেই গেল।"

দ্বিতীয় ছবি, দুই সখী পরস্পরে আলিঙ্গন-বদ্ধ হইয়া যাইতেছেন—

"পথে জড়াজড়ি, দেখিনু নাগরী,
সখির সহিত যায়।"

এই ছবি দেখিয়া কৃষ্ণের রাধাকে প্রাণ নিবেদন করিয়া দিবার আকাঙ্ক্ষা হইল—কৃষ্ণ বলিলেন, যদি কেউ সহায় হয়, আর এমন সৌভাগ্য হয়—

তবে—"তা সনে করি যে লে" ; লে অর্থ স্নেহ।

তৃতীয় ছবি ; রাধা ফুল দিয়া 'বল্' তৈরী করিয়া উর্দ্ধে ছুঁড়িতেছেন, আবার হাত বাড়াইয়া ধরিতেছেন—যেন জীবন্ত আনন্দের চিত্রপট। "ফুলের গেন্ধুয়া" ধরিবার সময় "বসন ভেদিয়া—রূপ উঠে গিয়া"—এই মোহিনী ছবি দেখিয়া কৃষ্ণ মুগ্ধ হইলেন। আবার যখন সে মুচকি হাসিয়া চলিয়া গেল—তখন কৃষ্ণ বিমূঢ় হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চতুর্থ দৃশ্য স্নানের ঘাটে। কিশোরী স্নান করিতেছেন,—যমুনার তীরে অলক্ত-রঞ্জিত কোমল পা আর একখানি পদ্মপ্রভ অলক্তরঞ্জিত পায়ের উপর রাখিয়া রাই অঙ্গ মার্জ্জনা করিতেছেন।

"শুনহে পরাণ—সুবল সাঙাতি
কো ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে, বসি তার নীরে,
পায়ের উপরে পা।"

পঞ্চম দৃশ্য রাই স্নান করিয়া ফিরিতেছেন :—

"চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

পর পর এক একটি ছবি কবিতায় ফুটিয়া উঠিতেছে। গায়ক এই সকল

গান আখর দিয়া গাহিয়া—এক পেলব-কোমল অপূর্ব্ব নারী-শিরোমণীকে উপস্থিত করেন।

তারপর যখন এই সুন্দরীকে প্রেমাভিষিক্ত করিয়া-নয়নাসারে সিঞ্চিত করিয়া—ধূলিতে লুণ্ঠিত করেন, তখন মধুর ও করুণ রসের অভূত-পূর্ব্ব মিলন হয়। কৃষ্ণের নাম শুনিয়াই তিনি সংজ্ঞাহীনা—"যে করে কানুর নাম তার ধরে পায়। পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়। সোনার পুতলী যেন ধুলায় লুটায়।"

কেমন করিয়া চণ্ডীদাস জানিয়াছিলেন, অর্দ্ধশতাব্দী পরে এক সোনার প্রতিমা নয়নজলে ভাসিয়া কৃষ্ণনাম শুনিবেন এবং যার তার পায়ে পড়িয়া কাঁদিবেন,—সেই গুঢ়রহস্য কি করিয়া বলিব? পার্থিব কোন কাব্যে একথা নাই যে শুধু নাম শুনিয়া প্রেমিকা বিহ্বলা হইয়া পড়েন। তখনও চোখের দেখা হয় নাই। এই নিগূঢ় প্রেম সাধনতত্ত্ব চণ্ডীদাসের মানস-পটে একখানি ছবির ন্যায় স্পষ্ট হইয়া জাগিয়াছিল, তাই বুঝি বিধাতা তাঁহার যাদু কাটি দিয়া ছুঁইয়া সেই ছবিখানি "নদের সোনার মানুষে" পরিণত করিয়া কবিকে স্রষ্টার সমকক্ষ প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন।

চন্দ্রকুমার ও কৈলাস সিংহের নিকট শুধু এই কবিতাগুলি পড়িয়া ক্ষান্ত হইতাম না—সমস্ত বৈষ্ণব-কবিতা চৈতন্য প্রভুর দ্বারা অধিকৃত দেখিতে পাইতাম। মনে হইত,—ভগবৎ প্রেমই কখন মানের মূর্ত্তি ধরিয়া পায়ে পড়িয়া কাঁদিত, ভগবৎ প্রেমই অপগণ্ড শিশুর মুখে বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য ও শক্তি আবিষ্কার করিত। প্রভাত-সায়াহ্নে আরতির শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদ, ধূপ-অগুরুর সুগন্ধ, পদ্মবনের ঈষচ্ছিন্ন রক্তিম ঘ্রাণ এ সমস্তই যেন বঙ্গদেশের পল্লীর হাটে, মাঠে, পথে ভগবদ্ভক্তির আবেশ ছড়াইয়া রাখিয়াছে। আমি মাতৃ-ভূমির, প্রতিপল্লীর ধূলিরেণু পবিত্র মনে করিতে লাগিলাম। ইহা আমার জাতীয়তা,

স্বদেশ-প্রেম প্রভৃতির কিছু নহে, ইহা আমার ইংরেজীর নকল করা কোন ভাব নহে। প্রকৃতই এই ভূমির প্রতি রেণু আমার চক্ষের জলের দাবী করিত। এক অব্যক্ত আকর্ষণে আমি বঙ্গদেশের মায়ায় পড়িয়া গেলাম।

ফিরিয়া ফিরিয়া চণ্ডীদাসের গানের দিকে সমস্ত প্রাণ উন্মুখ, উৎকণ্ঠিত হইয়া ছুটিত। কোথায় গেল আমার টিনটারণ এ্যাবি, এমন কি এত সাধের "চীনাংশুকমিবকেতোঃ।" কখনও পড়িতাম—"অবলা এমন তপ করিয়াছে কবে?" কৃষ্ণ স্বয়ং পরশমণি, যাহা শ্রীকরে ছুঁইয়া ফেলেন, তাই তো সোনা হইয়া যায়, তবে "কি লাগিয়া ধরে সখি চরণে আমার।' তিনি "একবার যাই" বলিয়া আমায় কত আদর করেন, বারংবার বিদায় চান,—অর্দ্ধপদ যাইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া কাতর হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন; আমার হাতে হাত রাখিয়া শপথ দেন যেন আবার দেখা হয়, পুনরায় দেখা পাওয়ার অনুমতির জন্য কত মিনতি করেন—

> "পদ আধ চায় পিয়া চায় পালটিয়া।
> বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া
> করে কর ধরি পিয়া শপথি দেয় মোরে।
> পুন দরশন লাগি কত চাটু বলে।"

এই সকল কবিতা সকালে বিকালে পড়িতাম, দিনরাত্র পড়িতাম,—এই কবিতাগুলি নির্জ্জনে একা একা আওড়াইয়া আনন্দ পাইতাম।

চণ্ডীদাসের কবিতার একটি প্রকৃতি এই যে, পর পর ছবি দিয়া কবি এক একটি রস জাগাইয়া তোলেন। ধরুন তাঁর মানের পালাটি; প্রথম ছবি মাধবী-তলাতে রাই চিবুকে হাত দিয়া বসিয়া আছেন—কাহারও সঙ্গে কথা বলেন না।

"এক নব রামা আছে রাধা সঙ্গে
তা সনে না কহে বোল।"

নিজের মনঃকষ্ট বুকের ভিতর রাখিয়া সঙ্গিনীসহ রাই একান্ত নিঃসঙ্গীর ন্যায় বসিয়া আছেন, আর তাঁর মর্ম্ম-বেদনাকে যেন রাগিনীর ছন্দ দিয়া একটি কোকিল সেই মাধবীর ডালে বসিয়া ডাকিতেছে।

"মাধবী ডালেতে এক পিক আসি
কহত পঞ্চম বোল।"

দ্বিতীয় দৃশ্য—কোকিলের সেই গান শুনিতে শুনিতে রাধার ভাল লাগিল না। রাই কোকিলকে—

"করতালি দিয়া, দিয়া উড়াইয়া"

আবার বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

তৃতীয় দৃশ্য—শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে দূতি আসিতেছেন—

"দূর হতে দেখি, দূতির গমন
করিলা শ্রীমুখ বঙ্ক।"

দূতি আসিয়া অনেক সাধিল,—সে বলিল "যাঁর জন্য তুমি ঘন ঘন পথের দিকে চেয়ে রাত্রি জাগরণ কর, যাঁর জন্য তুমি কত যত্নে বেণী বাঁধিয়া খোপা কর,—কালো বর্ণে প্রীত হইয়া কালো ফিতা দিয়া কেশ সজ্জা কর—যাঁর স্পর্শ তোমার কাছে লক্ষচন্দ্র স্পর্শ হইতেও শীতল, তাঁকে কি দোষে ত্যাগ করিলে, বল?"

দূতির কথা শুনিয়া রাধিকা কিছু বলিলেন না; মাধবী-তলা হইতে একটা তীব্র কটাক্ষ তাঁর দিকে নিক্ষেপ করিলেন মাত্র। তারপর খানিকটা চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন, কৃষ্ণ কি করিতেছেন—সেটা জানা

চাই, তাই চোখ মেলিয়া বলিয়া বলিলেন, "কেন এসেছ ? কি বলিবে বল।"

তখন কতকগুলি ছবি একে একে অবতারিত হইল, দূতি বলিলেন,—

"তোমার বেণী হইতে যে ফুলটি পড়িয়াছিল, তাহা কুড়াইয়া কৃষ্ণহাতে রাখিয়াছেন, তাঁহার চোখের জলে সে ফুলটি ভিজিয়া গিয়াছে।

"তাঁকে দেখিবে তো আমার সঙ্গে চল, মরকত-মণির মত সে ধূলায় লুটাইয়া আছে। তার মালতীমালা বিজড়িত চূড়া কোথায় পড়িয়া গিয়াছে তাহার ঠিক নাই, তাঁর নূপুর ও বলয় কোথায়, কে তার খোঁজ লয় ? পীত ধরার আচল ধুলায় লুটাইতেছে, নবমঞ্জরীর দল ধরিত্রীর বক্ষে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে।" পর পর এই ভাবের ছবি দিয়া চণ্ডীদাস একটা গাঢ় অনুভূতির রাজ্যে আমাদিগকে লইয়া যাইতেছেন।

তাঁর প্রেমের কবিতা—এক আনন্দ-লোকের জিনিষ। চির-বিরহী জন যদি অভীপ্সিতকে পায়, তবে জিহ্বা কথা বলিতে পারে না,—তার অভিব্যক্তি হয় শুধু অশ্রুতে। সারা জীবনের আরাধনার পর যদি কোন ভক্ত ভগবানকে দর্শন করে, তবে তাহার ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত করে না, সে চোখের জল ছাড়া আর কিছু দ্বারা আনন্দ-ব্যক্ত করিতে পারে না। একমাত্র শিশু হারাইয়া যে জননী উন্মত্তাবস্থায় জীবন কাটাইয়াছেন, দেব-প্রসাদে যদি সেই বালক সহসা মাতৃবক্ষে ধরা দেয়, তখনকার আনন্দ অনির্বচনীয়, তাহার ভাষা চোখের জল ছাড়া আর কিছু নহে, ভাষার কি সাধ্য তাহা প্রকাশ করে ?

চণ্ডীদাসের কবিতা সেই অশ্রু-রাজ্যের। এখানে এক একটি কথা, ক্ষুদ্র অশ্রু বিন্দুর ন্যায়, তাহা বহু ব্যথা-জাত আনন্দের অভিব্যক্তি—"যথা তথা যাই আমি যত দূর চাই। চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলকে জুড়াই।"

অতি সহজ সরল কথায় সেই চিরবিরহমথিত দর্শনানন্দের কথাই বুঝাইতেছে। "এছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ। মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখি চাঁদ মুখ।"—সেই একই কথা কত ভঙ্গীতে বলা। মুমূর্ষু একবার দর্শনানন্দের জন্য তীর্থে যায়—এই কবি সেইরূপ তীর্থযাত্রী। যে আনন্দ-নিলয়ে গেলে ভাষা পাছে পড়িয়া থাকে, ভাব একাকী চলিয়া যায়,—চক্ষু অশ্রু লইয়া অর্ঘ্য সাজায়—এই কবিতা সেই স্বর্গীয় রাজ্যের। এখানে কবিত্বের বৈদ্যুতিক আলোকে স্বর্ণ-বর্ণ উজ্বল রেখা জলে না, এখানে পবিত্র ঘৃতের সলতায় অলঙ্কার-বিরল মৃণ্ময় পাত্রের আরতির দীপ মন্দিরটি সুগন্ধ ও উজ্বল করিয়া রাখে।

চণ্ডীদাসের কবিতায় যে জিনিষটা কতকটা শীলতাকে ডিঙ্গাইয়াছে, তাহা কৃষ্ণ-কীর্ত্তনেই বেশী, তাহা জয়দেব এবং পূর্ব্ব সুরিদিগের শিষ্যত্বের প্রেরণা প্রমাণ করে। কিন্তু পাঁকের উপর পদ্ম জন্মিয়াছে। তাঁহার আত্ম-নিবেদনের পদগুলি পৃথিবীটাকে শুধু একটা রেখায় ছুঁইয়া আছে মাত্র, বিদ্যুল্লেখার ন্যায়। কিন্তু বসুধা-তল হইতে সে স্বর্গীয় জিনিষটা আসে নাই, তাহা জয়দেবী প্রেরণা নহে, তাহা দৈব-প্রেরণা,—তাহা চেষ্টা করিয়া অনুকরণ করিয়া কেহ পায় না, হঠাৎ দেব-প্রসাদে যেমন কেহ কৌস্তুভ মণিটি পাইয়া বসে—এ সেইরূপ পাওয়া।

এই প্রেমকে তিনি অখণ্ড রূপে দেখিয়াছিলেন। পিতৃস্নেহ, সখ্য ও যৌন প্রেম, সেই অখণ্ডকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দেখায়—কিন্তু যিনি পূর্ণভাবে উহা পাইয়াছেন, তাঁহার চক্ষে সেই অখণ্ড জিনিষটার মধ্যে, দাস্য, বাৎসল্য প্রভৃতি সকল ভাবই আছে, এজন্য তিনি রামীর মধ্যে পিতা মাতা ও সমস্ত দেবতাকে পাইয়াছিলেন। এই প্রেম পাইয়া তিনি মানুষকে দেবতাদের অপেক্ষা বড় মনে করিয়া বলিয়াছিলেন "শুনহে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ বড়, তাহার উপরে নাই।" এই

প্রেমের ধ্বংস তিনি স্বীকার করেন নাই—এজন্য তিনি বলিয়াছিলেন, "পিরীতি করিয়া ভাঙ্গয়ে যে, সাধন-অঙ্গ পায়না সে" এই মানুষ-প্রেম সাধনা না করিলে ভগবানকে পাওয়া যায় না, এজন্য তিনি বলিয়াছিলেন—"ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন, কেহ না চিনিতে পারে, প্রেমের আরতি যে জন জানয়ে, সেই সে চিনয়ে তারে।" এই সাধনার পথে ইন্দ্রিয় অন্তরায়, ইহা বুঝাইতে তিনি কহিয়াছেন—প্রেম সাধনা করিতে হইলে দেহকে "শুষ্ককাষ্ঠসম" করিতে হইবে। প্রেমের মর্ম্ম যে না জানে—তাঁহাকে তিনি মন্দিরের বাহিরে থাকিতে বলিয়াছেন। প্রকৃত ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় তাঁহারই অধিকার, যিনি মর্ম্ম বুঝিয়াছেন, শুধু সূত্রব্যাখ্যা করেন না। যাঁহার বাহিরে ইন্দ্রিয় খোলা রহিয়াছে,—ভিতরকার সত্য তাঁর নিকট ধরা পড়িবে না।

"মরম না জানে ধরম বাখানে
এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি, তাদের কথায়
বাহিরে রহন তারা॥
আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে,
ভিতর দুয়ার খোলা।"

এই চণ্ডীদাসের পুঁথি হাতে করিয়া চন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে, কৈলাস বাবুর উৎসাহে—আমার অন্তরের দেবতা যে পূজা চাহিতেছিলেন, তাহার নৈবেদ্য তৈরী করার আন্তরিক ইচ্ছায় আমি পুঁথি সংগ্রহে বাহির হইয়া পড়িলাম।

আমার পুঁথি খোঁজার ইতিহাসটা একটা অদ্ভূত গোছের। সংস্কৃত পুথিরই লোক খোঁজ সন্ধান করিত; বাঙ্গলা পুথির কোন খোঁজই কেহ লইত না। ১৮৯০ সনেও আমরা আত্মীয় স্বজনের নিকট ইংরেজীতে

চিঠি লিখিতাম। তাহার পূর্ব্বে বাবাকে যত চিঠি লিখিয়াছি, তাহার বোধ হয় সকল গুলিই ইংরেজীতে। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কবিকঙ্কণ আমি খুব আনন্দের সঙ্গে পড়িতাম বটে, কিন্তু বাঙ্গালা পুথি যে পল্লীতে পল্লীতে তুলট কাগজের থলি খুঁজিলে পাওয়া যায়, একথা তখন কাহারও মনে উদয় হয় নাই। হঠাৎ একদিন কে আমায় "মৃগলুব্ধ" নামক একখানি প্রাচীন হাতের লিখিত পুঁথির খোঁজ দিয়া গেল। সেই পুথিখানি সংগ্রহ করিতে যাইয়া জানিতে পারিলাম, সেরূপ আরও অনেক অপ্রকাশিত পুঁথি ত্রিপুরা-জেলায় আছে। তখন আমি এই কাজে আমার প্রকৃতির সমস্ত ঝোঁকের সঙ্গে লাগিয়া পড়িলাম। একজন খবর দিয়া গেল, "পরাকলি" মহাভারত নামক একখানি বই সেই জেলায় প্রচলিত ছিল। কাশীদাসী মহাভারতের পূর্ব্বে লোকে সেই মহাভারত পড়িত। আমি বুঝিলাম "পরাকালী" "পরাকৃত" বা "প্রাকৃত" কথার বিকৃতি, ভাবিলাম প্রাকৃত ভাষায় একখানি মহাভারত পাইলে ভাষাতত্ত্ব হিসাবে সে আবিষ্কার মহামূল্য হইবে। বহু অনুসন্ধানের পর "পরাকিলি" মহাভারতের খোঁজ পাইলাম, কিন্তু দেখিলাম তাহা লৌকিক প্রাকৃতে রচিত মহাভারত নহে ;—উহা পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর বিরচিত মহাভারত। এই মহাভারতের এতদূর প্রচলন ছিল যে ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ঢাকা ময়মনসিংহ এমন কি বর্দ্ধমাণ হইতেও ইহার পুথি পাওয়া গিয়াছে। তাহার পূর্ব্বের সঞ্জয় রচিত মহাভারত পাইলাম। এইভাবে যখন প্রায় ১০০ শত অপ্রকাশিত বাঙ্গালা পুথির সংগ্রহ হইল. তখন মাসে মাসে তাহার বিবরণ-সম্বলিত সন্দর্ভ "সাহিত্যে" প্রকাশিত করিতে লাগিলাম এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ আমাকে উৎসাহ দিয়া পত্রাদি লিখিতে লাগিলেন।

আমি এই পুথি ক্রয় করিবার জন্ত অনুরোধ করিয়া, এসিয়াটিক

সোসাইটির ডাঃ হোরনলি মহাশয়কে চিঠি লিখিলাম। তিনি পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপর ভার দিলেন। একদিন সকাল বেলা একটি গ্লাডেষ্টোন ব্যাগ হাতে করিয়া গৌরবর্ণ—ঈষৎ গুম্ফ রেখা লাঞ্ছিত শ্রীমুখ-শালী, ফিট্ বাবুর মত, পণ্ডিত বিনোদ বিহারী কাব্যতীর্থ আমার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। যৌবন বিনোদের দেহে যে শ্রী দিয়াছিল, এখন আর তাহা নাই। তাহার দিব্য সেই নশ্বর কান্তি এখন স্ফীতোদর খর্ব ছন্দ ধারণ করিয়াছে, সে বর্ণের উজ্জ্বল্য আর নাই, সংসার তাপ-দগ্ধ হইয়া ম্লানতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তখন বিনোদ আর আমি পল্লীতে পল্লীতে পুথি খুঁজিয়া ঘুরিয়াছি। বিনোদের বাড়ী ভাটপাড়া, সেখানে সংস্কৃত শকুন্তলার অভিনয় হইত, বিনোদ দুষ্মন্ত-চরিত্রের অভিনয় করিত। মাঠে মাঠে ঘুরিবার সময় বিনোদ কি মিষ্ট স্বরে, "তব কুসুম শরত্বং শীতরশ্মিত্বমিন্দো দ্বয়মেবাযথার্থং দৃশ্যতি মদ্বিধেষু" প্রভৃতি শ্লোক আওড়াইয়া যাইত। কখন ও হাত নাড়িয়া "কুসুমমিব লোভনং অঙ্গেষু সন্নদ্ধং" প্রভৃতি বলিয়া অধর প্রান্তে হাসির রেখা টানিয়া কোন পল্লীললনার সৌন্দর্য্যের প্রতি সশ্রদ্ধ ইঙ্গিত করিত। পুথিখোঁজা ব্যাপার লইয়া আমাদের যুব-চিত্তের কতটনা নিগূঢ় নিভৃত কক্ষ পরস্পরের নিকট উদ্ঘাটিত হইত। সেই হাটে মাঠে ঘাটে, পদ্মপলাশ লীলাময়ী বাপী, কুন্দ কোরকের মৃদু নিশ্বাস বাহী সুগন্ধি বায়ু, স্নানরতা পল্লীললনার অসম্বৃত ভাবে বস্ত্র-বিক্ষেপ-কারী অঞ্চলাশ্রিত দুরন্ত শিশু, হল-হস্তে, বিস্ময় চকিত দৃষ্টি কৃষক, রন্ধন শালার ধুম-জড়িত দেবী-প্রতিমার ন্যায় সুদর্শন গৃহলক্ষ্মীর উনুন জ্বালাইবার চেষ্টা, পদ্মপ্রান্ত কোমল শ্রীপদে নিপীড়িত ঢেঁকীর দ্রুত উত্থান পতন ও অবগুণ্ঠনবতীদের মৃদু মৃদু আলাপ ও ভূষণ গুঞ্জন, গ্রাম্য বৃদ্ধের কোলের দুলাল শিশুদের কাকলী, কত দৃশ্য, কত মূর্ত্তি আমাদের চক্ষের নিকট

বাইস্কোপের ছবির ন্যায় চলিয়া গিয়াছে, কখনও কল্পনায় দীপটিকে একটু উস্কাইয়া দিয়া গিয়াছে, কখনও চক্ষুণ্ডটি বিমুগ্ধ করিয়াছে, কখনও পরের বাড়ীতে লক্ষীর পদাঙ্ক কতকটা ইর্ষার উদ্রেক করিয়াছে। বিনোদ ছিল ২১।২২ বৎসর বয়স্ক, আমি ছিলাম ২৪।২৫, সুতরাং আমাদের বন্ধুত্বের রাজযোটক হইতে কোন বাধা হয় নাই।

বিনোদ মাঝে মাঝে আসিয়া ২।৩ মাস থাকিয়া চলিয়া যাইত, আমি বছর ভরিয়া পুঁথি সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতাম। সেটা হইল আমার নেশার মত। বাঙ্গলার পল্লী আমায় টানিত। মনে হইত পল্লী লক্ষ্মী কখন ও তাঁহার মালতী ফুল জড়ানো খোপার বেণী খুলিয়া, কখনও আলতা পরা পায়ের পদ্ম-প্রভায় আকর্ষণ করিয়া, কখনও কুসুম-বিজড়িত রৌদ্রাংশুর চুম্‌কি পরানো শ্যাম আঁচলের অসংবৃত শোভায় মুগ্ধ করিয়া কখন, নিবিড় মেঘোপম একরাশ চুল দেখাইয়া,কখনও আঙ্গিনায় পুঞ্জীকৃত সোনার ফসলের দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া, কখনও বাপীনীরে পদ্মবন সমাবৃত পদ্মোপম শ্রীমুখের শোভা দেখাইয়া ও স্ফুরদধরান্তরালে ফুল্ল কোরকের হাসির দীপ্তি উদ্ভাসিত করিয়া আমাকে ভুলাইয়া ফেলিতেন। পুঁথি খুজিতে যাইয়া আমি কখনও বৈষ্ণব সাজিয়াই জুতা পিরাণ প্রভৃতি একটা চাকরের হাতে দিয়া, তুলসীর মালা গলায় পরিয়া, কৃষ্ণনামের ছাপে কপাল ও বক্ষলাঞ্ছিত করিয়া,খঞ্জনী হাতে বৈষ্ণববৈষ্ণবীর দলে মিশিয়াছি। কখনও "বড্ড পিপাসা" ভাণ করিয়া কোন সূত্রের, ধোপা প্রভৃতি অনাচরণীয় জাতীয় লোকের বাড়ীতে যাইয়া পৈতাপ্রকটিত নগ্নদেহে সটান একটা মাদুরের উপর শুইয়া পড়িয়া তাহাদিগের কৃপা ও ভালবাসার উদ্রেক করিয়াছি, ভদ্রলোক সাজিয়া গেলে অনেকস্থলে পল্লীর আতিথ্যের দ্বার উন্মুক্ত হয় নাই। আমি চাষাদের সঙ্গে মিশিতে ভালবাসিতাম; বাঙ্গালা পুথি প্রায়ই নিম্নশ্রেণীর লোকদের ঘরে বেশী পাওয়া যায়। আমার

খুল্লতাত কালীশঙ্কর বাবু অনেকদিন সেট্‌লমেণ্ট আফিসর ছিলেন, তাহার সঙ্গে কখনও ক্রমাগত হাতীতে ঘুরিয়াছি. কিন্তু সরকারী পিয়নদের চাপরাস প্রভৃতি আসবাব দেখিলে গ্রামবাসীরা ভীত হইত। তাহাদের দ্বারা বরং পুথিসংগ্রহের বাধা হইত. এজন্য আমি একা যাইতাম। কখনও পার্ব্বত্যদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে রাত্রি হইয়া গিয়াছে, নিবিড় অন্ধকারে কখনও জল ঝড়, কখনও ভীষণ বনজঙ্গল ভেদ করিয়া অসম সাহস সহকারে রাত্রিকালে চলিয়া গিয়াছি। প্রাণের ভয় ছিল না। মরিলে আবার মাতৃকোল পাইব, এই কল্পনায় আঁধারে বন জঙ্গলের পঙ্কে চলিতাম। আমার মত দুর্ভাগ্য না হইলে কেহ আমার মত আগ্রহে প্রাণের আশা বিসর্জ্জন দিয়া—পুঁথি সংগ্রহ করিতে পারিতেন না। আমি রাস্তায় যাইতে কত চোট পাইয়াছি, আহত স্থানে হাত বুলাইতে যাইয়া চখের জলে ভাসিয়াছি। স্মৃতিতে একখানি কোমল শীর্ণ, স্নেহশীতল হাতের কথা মনে পড়িয়াছে যাহা আমার ব্যথিতস্থানে হাতবুলাইয়া আমার সমস্ত ব্যাধির পক্ষে অমৃত ও আরোগ্যের নিদান স্বরূপ ছিল।

একদিনের কথা মনে আছে। সহর হইতে প্রায় ১৩ মাইল দূরে এক এক বাড়ীতে গেলাম। শুনিয়াছিলাম, সে বাড়ীতে একখানি বড় পুথি ছিল। তখন বেলা একটা. কিছু খাওয়া হয় নাই। এক গয়লানী কুমিল্লায় আমাকে দুধ জোগাইত। তাহারই নাম করিয়া তাহার আত্মীয় গোপের গৃহে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম সেই বাড়ীর পুরুষেরা বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। একটি বৃদ্ধা ও তাহার একটি তরুণী নাত্‌নী সেই সেই বাড়ীতে ছিল। সেই মেয়েটির বয়স ১৫।১৬ হইবে। তাহার মূর্ত্তিটি পল্লী রাণীর ন্যায়, কি সুন্দর দুটী ডাগর চোখ! কি সুন্দর তাহার বর্ণ,—সে আমার সঙ্গে ঘোমটা খুলিয়া অবাধে কথা কহিতে লাগিল, বুঝিলাম সে বাড়ীর মেয়ে।

বুড়ি বলিল "বাবু বাড়ীতে আমার ছেলে নেই—পুঁথি এখন দেখাইবে কে?" সেই মেয়েটি বলিল "উনি ১৩ মাইল হেঁটে এসে বুঝি এই দেড়টার সময় এমনই ফিরে যাবেন! দেখ্‌ছ না? ওর মুখ শুকিয়ে গেছে, কিছু খান নি।" বৃদ্ধা তরুণার উক্তিতে পরাস্ত হইল; সে বলিল "বাবু কিছু খাবেন কি?" তাঁহার প্রশ্নের উত্তর শুনিবার জন্য দেখিলাম মেয়েটি তার ডাগর চোখ দুটি আমার মুখের দিকে উৎসুকভাবে ন্যস্ত করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। আমি সে আতিথ্য উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। বলিলাম "তোমাদের ঘরে কি আছে, আমি কি খাইতে পারি?" বৃদ্ধা বলিল "গাছের ভাল পাকা চাটিম কলা আছে, গয়লার ঘরে ঘন আউটান দুধ আছে, চিঁড়ে আছে, আর খেজুর গুড় আছে।" সেই বিগত মধ্যাহ্নে, ক্ষুৎপিপাসা পীড়িত আমার নিকট খাদ্যের ফর্দ্দটা বেশ উপাদেয়ই বোধ হইল। তখন সেই মেয়েটি কত যত্নে আসন পাতিয়া দিল, একটা গ্লাস খুব ভাল করিয়া মাজিয়া ঘষিয়া চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে করিয়া দিল; কড়া হইতে একটা বড় পুরু সর কলার পাতে করিয়া তুলিয়া আনিল এবং চিঁড়ে গুড় ও দুধ, কলা উপাচার লইয়া আতিথ্য করিতে লাগিল। বৃদ্ধার এ সকল আগ্রহপূর্ণ আতিথ্য ভাল লাগিতেছিল কি না জানি না, কিন্তু সে আমার গলার পৈতা দেখিয়া ভয় খাইয়া গিয়াছিল। সুতরাং প্রকাশ্যভাবে সে আমার খাওয়ার জন্য ব্যস্ততাই দেখাইতে লাগিল।

তরুণা আমার ভোজনান্তে একটা উঁচু মাচা দেখাইয়া বলিল—ঐ দেখুন ঐ মাচার উপর বইখানি রহিয়াছে। দেখিলাম কাষ্ঠের পাটায় আবদ্ধ বড় পুঁথি, চন্দনলিপ্ত দেহও বহু শুষ্ক বিল্বপত্র সমন্বিত হইয়া ঊর্দ্ধে মঞ্চোপরি বিরাজ করিতেছে। একখানি মই লাগাইয়া সেখানি পাড়িলাম। কিন্তু যখন বই নীচে নামাইলাম, তখন ভূতাশ্রিত ব্যক্তি রোজা আসিলে

যেরূপ চীৎকার করিতে থাকে, বৃদ্ধা সেইরূপ ডাক হাঁক পাড়িতে লাগিল। "ও হচ্ছে আমাদের সাত পুরুষের পুথি, উহা কখনও নামানো হয় না, শনি মঙ্গলবার ফুল ও বেল পাতা, ও চন্দন ছড়াইয়া উহার পূজা করিয়া থাকি। ঐ পুথির ডুরি কখনও খোলা হয় না, আপনার গলায় পৈতা, তা খুলিতে পারেন, কিন্তু যেমন ভাবে আছে, ঠিক তেমনই ভাবে রাখ্‌তে হবে" ইত্যাদি। আমি তখন পুথি পাইয়া সব ভুলিয়া গিয়াছি। এমন কি আমার পার্শ্ববর্ত্তিনী বিলোল-লোচনার কথাও আমার মনে নাই। ডুরি খুলিয়া দেখিলাম পুথিখানি একখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণ! যাহা হউক নূতন কিছু পাইলাম না—বলিয়া আক্ষেপ হইলেও যাহা কিছু প্রয়োজনীয় মনে করিলাম, তাহা নোট করিয়া লইলাম।

কিন্তু সেই ডুরি ফিরিয়া বাঁধিবার সময় হইল মুস্কিল। গোপকুলের দুগ্ধাদি খাইয়া কৃষ্ণ এতদূর বলবান হইয়াছিলেন যে তিনি অনায়াসে অঘাসুর বকাসুরকে বধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ৭।৮ পুরুষ পূর্ব্বে যে আহির-সন্তান এই পুথি ডুরি দিয়া বাঁধিয়াছিল তাহার বোধ হয় শাল-প্রাংশু মহাভুজ ছিল। যেরূপ কষিয়া আটিয়া পুথিখানি বাঁধা হইয়াছিল, তাহার ধারে কাঠের আধ ইঞ্চি ক্ষয় পাইয়া দাগ হইয়া গিয়াছিল। ধন্য সেই দড়ি! তাহা নারকেলের ছোবড়া, শণ কি যমকিঙ্করের দাড়ী দিয়া তৈরী হইয়াছিল—তাহা জানি না, কিন্তু সার্দ্ধ তিনশত বৎসর পরেও সেই দড়ি এত শক্ত ছিল যে, যে তাহা বল-প্রয়োগ কাটা যাইতে পারিত, কিছুতেই ছেঁড়া যাইত না। বুড়ী চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "যেমন কষিয়া বাঁধা ছিল তেমন করিয়া বাঁধ" আমার গায়ে কি অসুরের বল যে সেরূপ আঁটিয়া বাঁধিতে পারিব? তথাপি প্রাণপণে দড়ি শক্ত করিয়া আঁটিয়া বাঁধিতে লাগিয়া গেলাম; বুড়ি ক্রমাগত "হইল না" বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া "হায় হায়" করিতে লাগিল। আমার হাত লাল হইয়া

গেল, তারপর দুই একটি স্থান হইতে বিন্দু বিন্দু রক্তবাহির হইতে লাগিল। এই সময় তরুণী আসিয়া বলিল "ও কি? আপনার হাত দিয়া যে রক্ত বাহির হইতেছে! একটা দিক দিন আমাকে, আমি গয়লার মেয়ে, আমার হাত আপনার চাইতে শক্ত", এই বলিয়া সে আসিয়া দড়ির এক দিক ধরিল। দুইজনে দড়ি টানিতে লাগিলাম। মাথা নিচু করিয়া খুব জোরে দড়ি টানিবার সময় দুই একবার তাহার কপালের সিন্দুর আমার হাতে লাগিল। তাহার সেই পবিত্র চিহ্নের দাগ হাতে করিয়া আমি পুথির শেষ দুরি বাঁধিয়া ফেলিলাম। মেয়েটি আসিয়া বলিল "উঃ আপনার হাতে কত রক্ত!" আমি হাসিয়া বলিলাম, "সবগুলি রক্ত নয়?" সে সিন্দুর চিনিতে পারিয়া লজ্জিত হইল। আমি যখন বাড়ী ফিরিব, তখন প্রায় তিনটা, মেয়েটি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহাদের বাড়ীর পূর্ব্বদিকের রাস্তা পর্য্যন্ত আসিল, তাহার পর যতই আমি অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই সে একখানি ছবির মত বৃক্ষান্তরালে মিলাইয়া গেল।

এই সময় রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে আমার সর্ব্বদা পত্র ব্যবহার চলিতেছিল। তিনি সর্ব্বদাই আমাকে খুব উৎসাহ দিতেছিলেন। আমার কাজের অন্ত ছিল না। যে কতকদিন পুথি খুঁজিয়া বেড়াইতাম, তখন তো আহার নিদ্রার ঠিক ছিল না, "ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর"—এই অবস্থায় নৌকায় তাঁবুতে, পর্ণকুটীরে যে দিন ভগবান যেরূপ জুটাইতেন, সেইভাবে আড্ডা করিয়া লইতাম। কিন্তু যখন বাড়ীতে থাকিতাম, তখন সন্ধ্যায় মেটে প্রদীপের, ম্লান দীপ সম্মুখে করিয়া বসিতাম—কারণ কেরোসিন আমার চক্ষে সহ্য হইত না, সারারাতি মোমবাতি জ্বালাইয়া রাখা পয়সায় কুলাইত না। সলতেটি কাটি দিয়ে মাঝে মাঝে উস্কাইয়া দিয়া, গলিত তাম্রকুটপত্রের ন্যায় প্রাচীন পুথির পাতাগুলি ম্যাগনিফাইং গ্ল্যাসের সাহায্যে পড়িতে থাকিতাম। এক

এক খানি পাতা পড়িতে দুই ঘণ্টা কাটিয়া যাইত, কারণ যতরূপ পাখী ও চতুষ্পদের পা, ঠোঁট প্রভৃতি আছে, তত প্রকারের অদ্ভুত লিপি সেই সকল পুথিতে পাওয়া যাইত। আমি পড়িতাম ও নোট করিয়া যাইতাম, রাত্রি আড়াইটা বাজিলে আমার স্ত্রী চারটি পোলাও চড়াইয়া দিতেন, কিছু কিছু মাংস পূর্ব্বেই রাঁধা থাকিত। তিনটার সময় পুথি বন্ধ করিয়া চারটার মধ্যে ঐ রান্না খাইয়া শুইয়া পড়িতাম। আর বেলা ৮॥ টায় সময় ঘুম হইতে উঠিয়া বাহির ঘরে আসিয়া দেখিতাম বহুলোক অপেক্ষা করিতেছেন, কারণ সেখানে আমার খুব নাম পড়িয়া গিয়াছিল আমি একজন ভাল জ্যোতিষী, কোষ্ঠী দেখাইবার জন্য ও নূতন কোষ্ঠী করিবার জন্য বহুলোক আসিতেন, তার মধ্যে ডিপুটি সবজজ ও মুন্সেফেরা এ বিষয়ে আমাকে বিশেষ আপ্যায়িত করিতেন, তাঁহাদের বান্ধবতার ঋণ শোধ করিতে আমার কম শ্রম স্বীকার করিতে হইত না। ইহা ছাড়া ইংরেজীতে রিপোর্ট ভাল লিখিতে পারি বলিয়া ও আমার একটা নাম পড়িয়া গিয়াছিল, যেহেতু আমি খুড়া কালীশঙ্কর বাবুর সেটলমেণ্টের রিপোর্ট লিখিয়া দিতাম। কাহারও কাজ গিয়াছে, কাহারও কাজ চাই, কাহারও কৈফিয়তের জবাব দিতে হইবে, কাহারও বা সরকারী কার্য্যোপলক্ষে ভ্রমণবৃত্তান্ত আদি দাখিল করিতে হইবে,- এইভাবে রিপোর্ট লিখিবার উমেদার আমার নিকট অনেকে আসিতেন। তাঁহাদের পদধূলির সম্মান রাখিতে যাইয়া অনেক সময় আহারের অবসর পাইতাম না, স্কুলে যাইবার সময় তাহারা পায়ে পায়ে হাঁটিতেন। এইরূপ বিচিত্র রকমের কাজের তাড়ায় আমি এতটা ব্যস্ত হইয়াছিলাম ও গৃহে নানারূপ কলহ ও অশান্তিতে এতটা বিরক্ত থাকিতাম, যে আমার শরীর যেন কাজের বোঝা আর বহন করিতে চাহিত না।

ইহার মধ্যে আমার মাতুলেরা বহু ঋণগ্রস্ত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইবার

মধ্যে আসিলেন। মাতুল চন্দ্রমোহন সেন মহাশয় ঢাকা জেলা কোর্টে নামে মাত্র ওকালতী করিতেন; তাঁহার অর্থ উপার্জ্জনের কোনই প্রয়োজন ছিল না; যদি সম্পত্তির সামান্য একটু অংশ ছাড়াইয়া দিতেন, তাহা হইলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঋণদায় হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন এবং তাহাতে সম্পত্তির যেটুকু ক্ষতি হইত তাহা এত ক্ষুদ্র যে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু জমিদারীর কোন অংশ বিক্রয় করার পরামর্শ দিলে তিনি বলিতেন "তোমরা অঙ্গচ্ছেদ (amputation) করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে চাও, আমি তাহাতে রাজী নই।" একএকবার জমিজমা বিক্রয় করিবেন বলিয়া বাহিরে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাহা শুধুই মৌখিক। এইরূপ এক মুহূর্ত্তে তিনি আমায় লিখিয়া পাঠান, "তুমি শীঘ্র ছুটি নিয়ে আসিবে, এবং ভাওয়াল ষ্টেট আমার জমিদারীর কতকটা অংশ ক্রয় করিতে সম্মত হন কিনা, এবং দরসম্বন্ধে তোমার চেষ্টায় আমার পক্ষে কিছু অনুকূলতা হয় কিনা, কালী প্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের দ্বারা সেই চেষ্টা করিয়া দেখিবে।" ভাওয়াল ষ্টেটের ম্যানেজার রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তখন জয়দেবপুরে ছিলেন, আমি আমার পাঁচ বৎসরের শিশু কিরণ চন্দ্রকে লইয়া ঢাকায় রওনা হইলাম। কিরণকে কালীপ্রসন্ন বাবু ক্রোড়ে নিয়া তাহাকে "অধ্যাপক" উপাধি দিয়াছিলেন, ইহা তাহার অবশ্যই স্মরণ নাই, কিন্তু তাহার জীবনে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা।

মাতুলের যে এরূপ সুমতি হইয়াছে ইহাতে আমরা আনন্দিত হইলাম। জয়দেব পুর বেলা ৯টার সময় পৌছিলাম। রায়বাহাদুর বহু যত্ন করিয়া আমাকে গ্রহণ করিলেন, দিনের বেলায় কাজকর্ম্মের ভিড়। রাত্রে তাঁহার সঙ্গে সব বিষয়ে আলাপ হইবে, এই ঠিক করিলেন। রাত্রি ৮টা হইতে প্রায় দুইটা পর্য্যন্ত আমরা কথোপকথন করিয়াছিলাম। (বাঙ্গালা দেশে তাঁহার মত কথা বার্ত্তার প্রতিভা আমি আর কাহারও দেখি নাই,

তিনি বৃহস্পতির ন্যায় বাগ্মী ছিলেন, কথা বলিবার সময় মনস্বিতায় তাঁহার বৃহৎ চোখ দুটি যেন জ্বলিয়া উঠিত; দুইটি সুন্দর ঠোঁট উৎসাহিত ভাবে কথা বলিবার সময় যেন একটু একটু কাঁপিত, কোন তেজস্বিনী নদীস্রোত পুষ্পিত লতার উপর বহিয়া গেলে যেরূপ কাঁপে। যাহা বলিতেন তাহা বড় বড় সমাসাবদ্ধ শব্দে ঠিক পণ্ডিতের লিখিত ভাষার মত শুনাইত.প্রভেদ এই যে তাহা প্রাণের আবেগ বহণ করিত। অভিধানিক শব্দগুলি তাঁহার ক্রীড়াকন্দুকের মত ছিল। তাঁহার ধনুতে জ্যা দিবার শক্তি অন্য কাহারও ছিল না; গাণ্ডীব যেরূপ পার্থের, বীণা যেরূপ নারদের, তাঁহার ভাষা সেইরূপ তাঁহারই ছিল। তাহা অনুকরণকারীর নৈরাশ্য ও শ্রোতার চির-বিস্ময়। মাতুলের সম্পত্তি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিয়া তিনি সাহিত্যের কথা পাড়িলেন। চৈতন্য সম্বন্ধে বলিলেন, "মানুষ স্ত্রী পুত্রকে ভালবাসে, সেই ভালবাসার ছন্ন হইয়া যায় তাহা দেখিয়াছি, কাব্য নাটকে নায়ক নায়িকার প্রেম নানা সৌন্দর্য্যজালে জড়িত করিয়া কবিগণ উপস্থিত করেন,দেখিয়াছি, কিন্তু ঈশ্বরকে—অদৃশ্যকে—যে মানুষ সেই স্ত্রীপুত্র হইতে শতগুণ বেশী ভালবাসিতে পারে, ইহা একমাত্র চৈতন্যদেব জগতে প্রমাণ করিয়াছেন।" এই কথা তিনি "ভক্তির জয়" পুস্তকে শেষে লিখিয়াছিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি এত অনুরাগী কিসে হইলে?"

আমি বলিলাম—"বৈষ্ণব কবিদের গানের পালা শুনিয়াছেন, তাহা প্রায় সমস্ত রাত্রি ধরিয়া গীত হইয়া থাকে। কলহন্তরিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলব্ধা, মাথুর, অভিসার, পূর্ব্বরাগ ইহার প্রত্যেকটি একএকটি সুদীর্ঘ পালা। অন্যান্য কবিরা নায়ক নায়িকার কলহ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা নিছক্ ক্রোধের অভিনয়। প্রণয়ী-প্রণয়িনীর যখন পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস বর্ণনা করিয়াছেন, তখন তাঁহারা দেখাইয়াছেন, প্রেমে পড়িয়া পর-

স্পরকে খুন করা যায়,—অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা যায়। সুতরাং সেই সকল কাব্যের প্রেম-দেবতা অনেক সময় ভূতাশ্রিত হন।

কিন্তু বৈষ্ণব কবিবর্ণিত প্রেমে ক্রোধ মানরূপে ধরা দেয়। উহাতে প্রেমই ক্রোধের ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়, উহা যতটা আঘাত করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইতে অধিক আঘাত নিজে পায়, উহার প্রধান অস্ত্রশস্ত্র ফুল দিয়া গড়া। বৈষ্ণবকবিবর্ণিত প্রেমে চির পরিত্যাগের নাম মাথুর, উহাতে নাকি প্রেমকে যত পুষ্টি করে, এরূপ আর কিছুতেই করে না। বৈষ্ণব কবির প্রেমে ক্রুর ঠাট্টা ও ব্যাঙ্গোক্তির অভাব নাই কিন্তু সে যেন ফুলদিয়া শূল তৈরী করা। এক কথায় বৈষ্ণবের কাব্যে রাগ, দ্বেষ, কলহ, পরিত্যাগ সকলই আছে, কিন্তু তাহা পার্থিব রাজ্যের নহে ; তাহা উৰ্দ্ধলোকের। সেখানে সমস্ত ইন্দ্রিয়—প্রেমের স্বগণ, সেগুলি অসুর প্রকৃতি ভুলিয়া দেব-প্রকৃতি হইয়াছে। এই পালাগুলির মধ্যে নাট্য শিল্প, কলাকৌশল, সমস্তই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে, কিন্তু তাহাতে হিংসা,দ্বেষ, দেনা পাওনার হিসাব প্রভৃতি "বাজারে" রকমের কিছুই নাই। এ যেন যুথি, জাতি, কুন্দ, বেলা ও মালতীর বাগান, বিচিত্রতায় সুন্দর ; কোনটি শ্বেত, কোনটি লাল, কোনটি নীলাভ, কিন্তু সবগুলি ফুল। কাহারো গন্ধ তীব্র, কাহারো গন্ধ মৃদু, কিন্তু সবগুলি ফুল—এরূপ নিছক প্রেমের রাজ্য আর কোন সাহিত্যে আছে কিনা, তাহা আমি জানি না।"

কালীপ্রসন্ন বাবু আমার কথায় সুখী হইলেন। তার পর বঙ্কিমবাবুর কথা পাড়িলেন এবং বলিলেন, "দেখ—আমি পূর্ব্ববঙ্গের লোক বলিয়া ওদিক্ কার সমস্ত লেখকই আমাকে ঈর্ষা করতেন। কেবল বঙ্কিমবাবু আমারপ্রতি উদারভাব দেখাইতেন, কিন্তু তা ও প্রথম প্রথম। "বান্ধবের" যশ বিস্তার পাইলে তাঁহার সাহিত্য-চক্রে ভ্রমনশীল জ্যোতিষ্কগণের প্ররো-চনায় তিনিও শেষটা আমার প্রতি বিরুদ্ধ হইলেন! একবার আমি

কলিকাতায় গিয়াছিলাম, তখন ইহাঁরা দস্তুর মত আমার বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রটি পাকাইয়া তুলিয়াছেন। আমার লেখার প্রণালী—যাহাতে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার বেশী থাকে—তাই লইয়া আমাকে জব্দ করিবার অভিসন্ধি হইল। বঙ্কিমবাবু আমাকে একটা নির্দ্দিষ্ট দিন প্রাতে তাঁহার বাড়ীতে যাইতে অনুরোধ করিলেন। সেখানে যাইয়া দেখি চন্দ্রবাবু, চন্দ্রশেখরবাবু, মাষ্টার হরপ্রসাদ (বোধ হয়, বয়সে অল্প থাকার দরুণ শাস্ত্রী মহাশয়কে ইনি প্রায়ই আমাদের কাছে "মাষ্টার" বলিয়া উল্লেখ করিতেন) প্রভৃতি অনেক সাহিত্যিক বসিয়া আছেন। আমি বুঝিলাম, বাঙ্গালের বিরুদ্ধে দস্তুর মত একটা যড়যন্ত্র হইয়াছে। আমি যাওয়ার পর বঙ্কিমবাবু একখানি কাগজ বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন এবং বলিলেন "এইটিতে স্বাক্ষর করুন।" আমি দেখিলাম, সেইটির নীচে অপরাপর সাহিত্যিকদের সই রহিয়াছে। আমি উহা পড়িয়া দেখিলাম, তাহাতে লিখিত আছে "সর্ব্ব-সাধারণ যেরূপ লেখা বুঝিতে পারে, সেইরূপ লেখাই যুক্তি-যুক্ত।" আমি বলিলাম "এতে আমি কি করিয়া সই করিব? ধরুন, যদি দার্শনিক কথা লিখিতে হয়, তবে তাহার পরিভাষা আছে, তাহা সর্ব্ব-সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে না। কেহ যদি বেদসম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখেন, কিংবা অলঙ্কার শাস্ত্র লইয়া বই লেখেন, তবে কি তাহা শিশুর বোধ-গম্য হইবে?" এই বলিয়া তাঁহাদের কাগজটায় আমি আর একটি সূত্র লিখিলাম—"উদ্দিষ্ট বিষয়ের অনুযায়ী ভাষায় পুস্তকাদি রচনা করা উচিত।" এবং সেই লেখাটার নীচে সকলকে স্বাক্ষর করিতে আহ্বান করিলাম, একটা তর্কযুদ্ধ বাধিয়া গেল ও গোলমালে সভাটি ভাঙ্গিয়া গেল। সকলে চলিয়া গেলে বঙ্কিমবাবু আমাকে বলিলেন "ওহে, তুমি যে পদ্মাপাড় হইতে আসিয়া এতশীঘ্র আমাদের দুর্গটা জয় করিয়া যাইবে, ইহারা তাহা হইতে দেবে না।"

আমি জয়দেবপুর হইতে কুমিল্লা হইয়া ঢাকায় চলিয়া আসিলাম।

আমি বলিলাম, "ক্লাস পড়াতে দিয়া দেখুন না, বেশ ত, দেখি আপনার ছেলেরা বাঙ্গালকে কি কোরে ঘাল করতে পারে?"

বিঃ—"তোর তো বেশ সাহস আছে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না, তুই পারবি। বাঙ্গালের কর্ম্ম নয়; যাহোক তুই যখন চাচ্ছিস, আজ শনিবার—তুই সোমবার দিন ১১টার সময় মেট্রপলিটান স্কুলে যাস—আমি সেই সময় যাব,—তোকে ক্লাস পড়াতে দেব।"

পার্টিসনের পর হইতে বাঙ্গালের উপর এদিককার লোকদের উপদ্রব কতকটা কমিয়া গিয়াছে, নতুবা ময়নাবতীর গানের কবি হইতে চৈতন্যদেব, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি সকলেই ত বাঙ্গাল লইয়া খুব মজা করিয়া আসিয়াছেন, রঙ্গমঞ্চে বাঙ্গাল না হইলে ত অর্দ্ধেক আমোদই মাটী।

যদি ও শুনিলাম বাঙ্গাল মাষ্টার মেট্রপলিটানে বড় আমল পায় নাই, তথাপি আমার একটু ভয় হইল না। সোমবার দিন যথাসময়ে স্কুলে গেলাম প্রায় ১৫ মিনিট পড়ে উড়িয়াবাহকের স্কন্ধারূঢ় একখানি পাল্কী স্কুলের গেটে আসিয়া হাজির। তাহার মধ্য হইতে টাক-বিরলকেশ, চটি পায়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাহির হইলেন। আমায় দেখিয়া বলিলেন, "চল্, তোকে হেড-মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করিয়েই দি।" হেডমাষ্টার মহাশয়কে ডাকাইয়া তিনি লাইব্রেরী রুমে আমার সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলেন, এবং বলিলেন, "তুমি একে প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণী পড়াইতে দাও।" হেড মাষ্টার বাবু বলিলেন "আপনি দেখছি ছেলে মানুষ, কি পড়াবেন?" আমি বলিলাম, "ইংরাজী ও ইতিহাস" প্রথম শ্রেণীতে ইংরেজী পড়াইলাম, —আমার ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল—ছেলেরা আমার কথা গুলি স্তব্ধ হইয়া শুনিল—বোধ হইল যেন তাদের খুব ভাল লাগিল। কিন্তু শেষ কালে আমি বলিলাম "তোমাদের পড়া দেখছি খুবই কমই হইয়াছে, পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী—কি করিয়া সবটা শেষ করিবে?

যিনি ইংরেজী পড়ান, তিনি বেশ হিসাব ঠিক করিয়া পড়ান নাই।" এই বলিয়া যাই বাহির হইব, দেখিলাম দরজার পাশে হেড-মাষ্টার চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া আমার পড়ানো শুন্‌ছিলেন। তিনিই প্রথম শ্রেণীতে ইংরেজী পড়াইতেন। সুতরাং আমি আমার শেষ মন্তব্যটিতে তাঁকে যে একটু ঘা দিয়াছি, তা তাঁর কর্ণগোচর হইয়াছে ভাবিয়া একটু শঙ্কিত হইলাম। তারপরের ঘণ্টায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইতিহাস পড়াইলাম। উভয় শ্রেণীর ছাত্রেরাই যে আমার পড়ানোতে বিশেষ প্রীত হইয়াছিল, তাহা আমি সন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম। সুতরাং পরদিন অর্থাৎ মঙ্গলবার খুব গর্ব্ব-ভরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুবিখ্যাত চটীলগ্ন পাদযুগ্ম বন্দনা করিয়া স্মিত মুখে তাঁর আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি টেবলের ড্রয়ার হইতে একটা কাগজ বাহির করিয়া আমায় দেখাইলেন—তাহাতে হেড-মাষ্টার লিখিয়াছেন "প্রথম শ্রেণীর ছাত্রেরা খুশী হয় নাই, দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ ভালই বলিয়াছে।"

আমি বিদ্যাসাগর মহাশকে উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলাম "এ সকল আপনার হেড মাষ্টারের চালাকি, চলুন আপনি নিজে ছাত্রগণকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তারা যদি না বলে যে আমি আপনার হেডমাষ্টার অপেক্ষা ইংরেজী ভাল পড়াইয়াছি—তবে আমি কোন কাজ চাই না। হেডমাষ্টার নিজে ছেলেদের পড়া সম্বন্ধে কতকটা শিথিল, তাই বলিয়াছিলাম। ইহা যে তিনি দুতির মত কপাটের আড়াল থেকে শুনবেন, ইহা আমি জানতেম না—এই জন্য রাগ করে ঐরূপ রিপোর্ট দিয়াছেন।" বিদ্যাসাগর বলিলেন, "তোর ভিতর তেজ আছে, তুই পারবি অন্ততঃ একটা ক্লাস ত খুসী করিয়াছিস্। হেডমাষ্টার নিজে লিখেছে—আমি তা প্রত্যাশা করি নাই। বাঙ্গাল মাষ্টার পেলে ত ছেলেরা তাকে লাড্ডুর মত ব্যবহার করে। যা হোক, আমি আর কোন খোঁজ নেব না,

তোকে যোগ্য মনে করিলাম। কিন্তু তোর পূর্ব্বে পাঁচ ছয় জন যোগ্যতা দেখিয়েছেন—এই দেখ তাদের নাম। এরা কাজ পেলে তুই পাবি। আর ১½ মাস ২ মাস পরে আমি তোকে নিতে পারব। তুই মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করিস্।"

আমি বলিলাম "আমার যে কুমিল্লার স্কুল খুলিয়াছে। আমার ২।১ দিনের মধ্যে যেতে হবে। আপনি আমায় কাজ খালি হ'লে চিঠি লিখবেন।" তিনি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন "সে হবে না, তোর এখানে থাক্‌তে হবে। এখানে চাকুরী প্রার্থী এত লোক আছে যে কাজ খালি পড়লে তোকে কুমিল্লা হইতে চিঠি লিখিয়া আনাইবার সবুর সইবে না। বিশেষ দশ পনের দিন ক্লাশে পড়া বন্ধ রাখতে পারব না। তুই সেই চাকুরী এস্তাফা দিয়ে যদি এখানে থাক্‌তে পারিস, তবে দুই মাসের মধ্যে কাজ পাবি, এটি আমি বল্‌তে পারি।"

আমি বলিলাম "আগেই সেখানকার কাজ আমি ছেড়ে দিতে পারব না। বিশেষ আমার সেখানে একটা দায়িত্ব আছে। সেখানকার একটা ব্যবস্থা ক'রে তো ছেড়ে দিতে হবে।"

তিনি বলিলেন "তবে আমি আর কি করব ?" আমি পুনরায় তাঁকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

ইহার পর কলিকাতায় দুই তিন দিন ছিলাম। আমার মাসীমা তখন কলিকাতায় ছিলেন। আমার মাসতুত ভাই জগদীশ বাবু প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রফেসারী করিতেন ও ছোট ভাই গিরীশ ও হেম এখানে বি, এ পড়িত। সেই বাড়ীতে তখন ১৬।১৭ বছরের আর একটি যুবক থাকিতেন। ইনি আমার স্ত্রীর আপনার মামাত ভাই, এখন ইনি মিষ্টার জে, এন রায় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইনি তখন বিলাত যাওয়ার জন্য সবে পাখা ঝাপটাইতেছিলেন, এবং অনর্গল ইংরেজী কহিয়া

ও বাঙ্গলা কবিতা লিখিয়া,—কখনও বা একপায়ে জুতার এক পাটি, আর এক পায়ে অন্য জুতার আর এক পাটি পরিয়া সহর ভ্রমণ পূর্ব্বক নানা বিচিত্র ভাবে সেই বয়সেই উদীয়মান প্রতিভার প্রমাণ দিতেছিলেন। তিনি যে এ জগতে একটা কাণ্ড না করিয়া ছাড়িবেন না, তাহা আমরা তখনই জানিতাম। তাঁহার প্রতিভা কর্ম্ম-ক্ষেত্রে আজ শত নক্ষত্রের আলোকে প্রকাশ পাইয়াছে।

এই বাড়ীতে এক দিন আমি খাইতে বসিয়াছি, এমন সময় আমার মাসিমা বলিলেন—"তুই হাঁ কর দেখি, তোর গলার মধ্যে কি একটা দেখা যাচ্ছে—খুব বড় হাঁ কর" যাহাতক আমি সেইরূপ হাঁ করিয়াছি, অমনই আমার গলার ভিতর তিনি আধ কোয়া কমলা লেবু ও এক চাক আম প্রবেশ করাইয়া দিলেন, এবং আমি ভাল করিয়া অবস্থাটি বুঝিবার পূর্ব্বেই তাহা গিলিয়া ফেলিলাম। তার পর আমার দুই চোখ হইতে অজস্র অশ্রু পড়িতে লাগিল, আমি বলিলাম—"ছোট মাসী, তুমি কি করলে, মা মরেছেন আজ এই চার বছর, এই কয়েক বছর কমলালেবুর জায়গা শ্রীহট্টে থাকিয়া ও আমি নেবু খাই নাই। এই চার বছর আমি আম খাই নাই, আর জীবনে খাইব না, এইসঙ্কল্প করিয়াছিলাম। তুমি আমার সঙ্কল্প ভাঙ্গলে!" মাসিমা বলিলেন—"আমি তোর মাএর চাইতে কম কিসে? আমার বাড়ীতে এত আম আসে—আর তুই শোকের জন্য আম না খেয়ে থাকবি, এ কি আমার সহ্য হয়?" কলিকাতায় অসময়েও নেবু পাওয়া যায়—এই জন্য দুই ফল সম্বন্ধেই তিনি আমার সঙ্কল্প ভাঙ্গিতে পারিয়াছিলেন।

কলিকাতা হইতে কুমিল্লায় ফিরিবার পূর্ব্বে বঙ্কিম বাবুর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করিব, পূর্ব্বেই তাহা স্থির করিয়াছিলাম। এই জন্য বঙ্কিমবাবুর বন্ধু কালীপ্রসন্ন সরকার ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের নিকট হইতে এক

খানি পরিচয়-পত্র আনিয়াছিলাম। কালী প্রসন্ন বাবু গীতার ইংরেজী অনুবাদ করিতেছিলেন, আমি এ বিষয়ে তাঁর কতকটা সাহায্য করিয়াছিলাম। কালীপ্রসন্ন বাবু তাঁহার চিঠিতে সে কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমি ও আমার মামাত ভাই মতিলাল একদিন বেলা দুইটার সময় প্রতাপচাটুর্য্যের গলীতে বঙ্কিম বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। যে বাড়ীটা বঙ্কিমবাবুর বাড়ী বলিয়া জানিতে পারিলাম, তাহার দরজার কাছে দাঁড়াইয়া খুব চীৎকার শুনিতে পাইলাম। উঁকি মারিয়া দেখিলাম, এক নগ্ন দেহ গৌরবর্ণ বৃদ্ধ তৎসকাশে দণ্ডায়মান একটি নীরব নত-মস্তক ভৃত্যকে অনর্গল বকুনি দিয়া যাইতেছেন। আমরা দরজায় উঁকি মারিয়া দাঁড়াইয়াছি দেখিয়া তিনি খানিকটা অপ্রতিভ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কাকে চান্?" আমি বলিলাম "বঙ্কিম বাবুকে" তিনি বলিলেন "কোত্থেকে এসেছেন, কি দরকার?" আমরা উত্তরে বলিলাম, "কুমিল্লা হতে এসেছি, শুধু তাকে দেখব বলে।" বৃদ্ধটি দক্ষিণদিকের সিঁড়িটা দেখাইয়া বলিলেন—"ঐ সিঁড়ি দিয়া উপরে যাইয়া অপেক্ষা করুন।"

আমরা উপরে যাইয়া দেখিলাম, একখানি নাতিবৃহৎ ঘর, তার একদিকে একখানি টেবিল ও তার চার দিকে খান কতক চেয়ার! ঘরে আস্‌বাবের বাহুল্য নাই—যদিও ইহা বৈঠকখানা বলিয়াই বোধ হইল। আমরা বসিবার ২।৩ মিনিট পরেই দেখিলাম, সেই বৃদ্ধ একটা জামা গায়ে চড়াইয়া সভ্য ভব্য হইয়া আসিলেন, তিনিই যে বঙ্কিম বাবু তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তার গোঁপ দাড়ী কামানো, রংটি বেশ ফর্সা, মুখের হাঁ একটু বড়, চক্ষুদুটি উজ্জ্বল কিন্তু বড় নহে; দীর্ঘাকৃতি, তিনি আসিয়া এক খানি চেয়ারে বসিয়া হাত বাড়াইয়া কালী বাবুর পত্র খানি লইয়া পড়িলেন, এবং তিনি কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করিলেন।

কুমিল্লার জলবায়ু, ধান চালের অবস্থা, লোক-সংখ্যা, স্কুল কলেজের কথা প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই আলাপ চলিল। যতবার আমি সাহিত্য সম্বন্ধে আলাপ করিতে চেষ্টা করিলাম, ততবার তিনি সে কথা এড়াইয়া ধ্যানাদি সম্বন্ধে প্রশ্নের অবতারণা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমার তাঁহার লেখনী নিঃসৃত কত প্রতিভা-দীপ্ত রচনার কথাই মনে পড়িতে লাগিল—একবার মনে হইল—"ধীরে রজনী ধীরে, অন্ধ অথচ কুঞ্চিত ভ্রূ, বিকলা অথচ শীর্ণা, দূরাগত রাগিণীর ন্যায়, অর্দ্ধবিকসিত কুসুম সুরভির ন্যায় রজনী ধীরে ধীরে জলে নামিতেছে।" আর এক বার মনে পড়িল, "কোকিল তুই একবার ডাক দেখিরে, কণ্ঠ নাই বলিয়া আমি আমার মনের কথা বলিতে পারিলাম না"—এবং পুনরায় "শোন ওসমান, আবার বলি, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর" প্রভৃতি কত ছত্র মনে পড়িল। শার্দ্দূল চর্ম্ম পরিহিত জীবন্ত শার্দ্দূলের ন্যায় কাপালিককে মনে পড়িল। অগ্নিদেব যাহার "পা দুখানিকে কাষ্ঠ ভ্রমে চিবাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিছু মাত্র রস না পাইয়া অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছেন" সেই "সহর্ণেঘিঃ" পাঠ নিরত দিগগজকে মনে পড়িল; এলায়িত কেশা, বনলক্ষ্মীর ন্যায় নির্জ্জন সমুদ্র তীরে কপালকুণ্ডলার বীণা কণ্ঠ নিনাদিত "পথিক, তুমি কি পথ হারিয়েছ" প্রভৃতি মনে পড়িল,—আমার, বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, সাহিত্য প্রসঙ্গে ইহার সঙ্গে কিছু কাল আলাপ করি। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর শৈল কঠিন গাম্ভীর্য্য বোধ হয় আমার পল্লাপাড়ী কথার টানে আরো জমাট হইয়া উঠিতেছিল; তিনি যেন মনে করিলেন, আমি একটি কৃষক যুবক, সুতরাং লাঙ্গল, কাল ও চাষাবাদের কথা ছাড়া আর কিছু বলিবার উপযুক্ত নহি। বিষবৃক্ষ ও কপাল কুণ্ডলার লেখক আমার নিকট এইরূপে দেখা দিলেন; আমি ভাবিয়াছিলাম যদি একবার সাহিত্যের কথা আমার



শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ,

সঙ্গে পাড়িতেন, তা হলে মারলোর ফষ্ট ও শিলারের এপিসিকাইডন হইতে কবিতা আওড়াইয়া তাঁহাকে আমি আমার বিক্রম দেখাইয়া দিতাম, —চণ্ডীদাস—বিদ্যাপতি—গোবিন্দ দাস যে গীতি-কবিতার রাজা তাহা বুঝাইয়া দিয়া আমি তাঁহার নিকট হইতে বিস্ময় ও প্রীতির স্তোক-বাক্য আদায় করিয়া লইতাম। কিন্তু তিনি আমাকে সে সুযোগ দিলেন না। তিনি শুধু বই লিখিয়াই সাহিত্য-সম্রাট না কথাবার্তায় ও সাহিত্য রস প্রচুর রূপে দিতে পারেন তাহা বুঝিবার সুবিধা পাইলাম না। বঙ্কিম-বাবুকে আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিলাম কিন্তু তাঁহার বই পড়িয়া তাহার যেরূপ মনে মনে আঁকিয়াছিলাম, সে আমার ধ্যান-লোকের বঙ্কিম-বাবুর কোনই আভাষ সাক্ষাৎকারে পাইলাম না, সুতরাং সাক্ষাৎ বিফল হইল।

আমি কলিকাতা আসিয়া দেখিলাম, রামদয়াল আর ঠিক তেমন নাই; সাহিত্যিক কথা লইয়া যে দিন রাত থাকিত সে শুধু ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া বেড়াইতেছে। আর্য্যমিশান ইনস্‌টিটিউসনের সে হেডমাষ্টার হইয়াছে, তাহার স্বত্বাধিকারী পঞ্চানন বাবুর নিকট সে দীক্ষা লইয়াছে। এদিকে মহাকালী পাঠশালার মাতাজী এবং আর একটি নবীনা বাঙ্গালী মাতাজী, এই দুই জনে তাঁর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতেছেন। সে এমন সকল কথা বলিতে লাগিল, যাহা আমাদের মাথা ডিঙ্গাইয়া চলিয়া যায়। বাঙ্গালী মাতাজীর সঙ্গে সে আমার পরিচয় করাইয়া দিল; আমার ইতিপূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল—স্ত্রীলোক ভালবাসার জিনিষ, পূজার জিনিষ। তিনি সুখদুঃখের সঙ্গিনী হইতে পারেন, পালন করিতে পারেন, নিতান্ত ধীর বুদ্ধি ব্যক্তিকেও কবিত্ব-কল্পনা দিয়া স্বপ্নাবিষ্ট করিতে পারেন—কিন্তু শিক্ষা দীক্ষা ও গুরুতর চিন্তা-শীলতায় তিনি কখনই পুরুষের সমকক্ষ হইতে পারেন না। মাতাজার সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে মিশিয়া আমার সে ভ্রম

ঘুচিয়া গেল। এক একদিন সন্ধ্যা হইতে সুরু করিয়া রাত্রি একটা পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিয়াছি; তাঁহার কল্পনা শক্তি অদ্ভুত ছিল, বুদ্ধি ক্ষুর-ধার ছিল। ভাব-রাজ্যের তিনি রাণী ছিলেন। তিনি আমার সামান্য গুণের পক্ষপাতিনী হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে সাংসারিক এই ধূলিকণাময়, বৈষয়িক বিষয়ে লিপ্ত হিসাব নিকাশ সমাবৃত ভবের বাজারের কেউ বলিয়া মনে করিতাম না; যেমন সপ্ততন্ত্রীর অতি উচ্চ সুর, তাহা কোকিলের পঞ্চম স্বরের উপরে ওঠে, যেমন পদ্মের সুরভি, মালতী, বেলা প্রভৃতির সুগন্ধকে অতিক্রম করিয়া তাহা উর্দ্ধলোকে চলিয়া যায়, তেমনই ছিল তাঁর জীবন;—তাহা সংসার ছাপাইয়া,—কেবলই স্বর্গ রাজ্যের কথা লইয়া থাকিত। জীবনে আরও দুই জন স্ত্রীলোককে আমি মানস পটে খুব বড় রেখায় আঁকিয়াছি, কিন্তু ভাব-জগতের এই সাম্রাজ্ঞী তাঁহার স্বস্থানে অদ্বিতীয়। ভক্তির কথা বলিতে যাইয়া তিনি সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিতেন, তার কথা শুনিতে শুনিতে দিন অতিবাহিত হইয়া যাইত, রাত অতি-বাহিত হইয়া যাইত; মনোহরসাই কীর্ত্তনের মত তাহা আমায় আকর্ষণ করিত—তাহার যোগশাস্ত্রে অসামান্য জ্ঞান ছিল—আমার মাতুলালয়ের সকলেই তাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়াছিল, শুনিয়াছি তাঁহার কতকগুলি অসামান্য শক্তি হইয়াছিল, সে সকল বিভূতি আমি দেখিতে চাহিতাম না। আমি তাঁহার নিকট দীক্ষা লই নাই, আমি যোগতত্ত্ব শুনিতে চাহিতাম না, তাঁহার ভাব ও ভক্তির কথার আবেগে ঝঞ্জাতাড়িত ফুলটির মত আমার মন কোথায় উড়িয়া যাইত; তিনি বলিতেন—"দীনেশ, তুই আমার নিকট দীক্ষা নিলি না, কিন্তু তথাপি তোকে আমার যত ভাল লাগে—শিষ্যদের কারুকে তেমন লাগে না" এই কথায় আমি ধন্য হইয়া যাইতাম। সংস্কৃত গীতাটি সমস্ত এবং উপনিষদগুলি বহু অংশ তাঁহার মুখস্থ ছিল। সিউলী ফুল যেরূপ প্রভাত বায়ুতে টপ টপ করিয়া মাটীতে পড়ে,

তাঁহার কথার মধ্যে সেইরূপ ব্যাথার সঙ্গে সেই শ্লোক গুলি অজস্র ঝরিয়া পড়িত।

রামদয়ালকে একদিন আমি বলিলাম "দেখ দয়ি, আমি কুমিল্লায় বড় কষ্টে দিন কাটাইয়া থাকি, কতকগুলি জীর্ণ পুথি আমার সম্বল, আমি ইংরেজী পড়া ছাড়িয়া দিয়াছি। পৃথিবীতে আসার পর মা আমায় যে ভাষা শিখাইয়া ছিলেন, আমি তাঁহারই অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছি; সেই ভাষার কবিরা আমাকে আনন্দ ও ভাব দিয়া থাকেন, নতুবা নানা কষ্টে আমি মরিয়া যাইতাম। আর এক আমার আশ্রয় আছে তোমার পত্র। তুমি পত্র লিখিলে আমার আবার শৈশবের সুখ-স্বপ্নগুলি ফিরিয়া পাই, জীবনের পবিত্র ব্রতগুলি, উচ্চ আদর্শ সকল মনে উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। মনে আছে গেটে প্রতি বৎসররে প্রথমদিন সিলারকে পত্র লিখিতেন, সিলার প্রতি বৎসর গেটেকে পত্র লিখিতেন। পরস্পরের পরিচয় হওয়ার পর থেকে আমরণ এই পত্র ব্যবহার চালাইয়াছিলেন। তুমি প্রতিশ্রুত ছিলে যে আমরা ও এইরূপ করিব। আজ আমি বড় কষ্টে পড়িয়া তোমার নিকট আসিয়াছি। সংসার ত কেবলই পুরাতন কথা ভুলাইয়া দেয়। এই যখন আমরা দুজনে কথা বলিতেছি এর মধ্যেই ত সময় একটা ব্যবধানের প্রাচীর তুলিয়া দিতেছে; তুমি আমি দূরে থাকিলে সপ্তাহে অন্ততঃ তিনখানি চিঠি পরস্পরকে লিখিয়াছি, কিন্তু এখন তোমার চিঠি মাসে একখানির বেশী পাই না। হয়তঃ কালে পত্র লেখালিখি একবারেই বন্ধ হইয়া যাইবে। তোমার সেটা ক্ষতির কারণ না হইতে পারে, কারণ এখন তুমি ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছ; কিন্তু তোমার চিঠি না পাইলে আমি কোন অধঃপাতে যাইব তার ঠিক্ নাই, হয়ত আত্মহত্যাও করিতে পারি। তোমার চিঠিতে অতীতের আদর্শের সঙ্গে আমার বর্ত্তমান জীবনের যোগ রাখিয়াছে। যাহা হউক এস, আমরা আজ সেই পুরাতন প্রতিশ্রুতি

পুনরায় দৃঢ় করি। অন্ততঃ বৎসরের প্রথম দিন আমরা আমরণ পরস্পরকে চিঠি লিখিব।"

রামদয়াল বলিল "আমি সেরূপ প্রতিশ্রুতি আর করিতে পারিব না। আমি সাংসারিক কোন বিষয়েই আর পূর্ব্বের মতন নেই, আমি একটা প্রতিশ্রুতির বোঝা মাথায় চাপাইয়া জীবনকে সাংসারিকতায় আবদ্ধ করিতে পারিব না।"

আমি অনেক সাধিলাম, এমন কি চোখের জল ফেলিলাম, আবেদন নিবেদনে কথাবার্ত্তা করুণ করিয়া তুলিলাম ; ভিক্ষা চাহিলাম কিন্তু নির্লিপ্ত যোগীর মন টলাইতে পারিলাম না। তখন রাগ করিয়া চলিয়া গেলাম। তখন মনে হইল আমি সম্পূর্ণ একা, এজগতে আমার কেউ নাই, যাহাকে প্রাণাপেক্ষা বেশী ভালবাসিয়াছি, সে বৎসরে একখানা চিঠি লিখিবার ভার লইল না ; আমাকে ছাড়িয়া দিল। মাতাজীর নিকটে যাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম. তিনি বলিলেন "ও ঐরকম কাঠ খোট্টা, ওর মধ্যে এত টুকু রস নাই!" আমি কুমিল্লা আসিয়া দেখি রামদয়াল আমাকে চিঠি লিখিয়াছে, আর্য্যমিশন ইনষ্টিটিউসনে আমাকে একটা কাজ দিয়াছে, বেতন কুমিল্লায় যাহা পাইতাম, তার চাইতে ১০৲ টাকা বেশী। আমি লিখিলাম—"আমি তোমার সঙ্গে একস্থানে কাজ করিতে পারিব না"— রামদয়ালের শত শত চিঠি পোড়াইয়া ফেলিলাম। অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে ভগবানের নিকট বলিলাম, "আমাকে দুর্দ্দিনে কে রক্ষা করিবে! পৃথিবীর সকলেই ত আমায় একে একে ছাড়িয়া দিয়েছে—আমার মরিবার পথ বলিয়া দাও, আমি কার মুখ চাহিয়া ভাল থাকিব? আমি ভাল হই, মন্দ হই, তাতে ত কারু আসে যায় না। কারু চক্ষু তো—আমি কাঁটা বনে চলিলাম কি ফুলবনে আসিলাম—তা' দেখবার নাই, আমি এখন কি করিব?" তখন চতুর্গুণ পরিশ্রম করিয়া বঙ্গভাষার ইতিহাস লিখিতে

লাগিলাম, চতুর্গুণ পরিশ্রম করিয়া পুঁথি খুঁজিতে লাগিলাম, প্রাণপাত করিব, এই হইল সঙ্কল্প। এক হয় সাপের মুখে প্রাণ দেব, না হয় খাটিতে খাটিতে প্রাণ দেব। কেউ যখন চাইল না, বৎসরে একখানি চিঠি লিখিবার ভার কেউ নিল না,—আমার জন্য যখন এতটুকু মমতা পৃথিবীর কারু নাই, তখন মরিয়াই শান্তি লাভ করিব। হে ভগবান, খাটিয়া খাটিয়া প্রাণ দেব। তুমি জগত হইতে আমার স্নেহ-মমতার পাঠ উঠাইয়া নিলে, কিন্তু তোমার পাদপদ্মে এই তুচ্ছ অকেজো জীবনটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দেব। এই প্রার্থনা করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

কুমিল্লা-জীবনের শেষাঙ্ক

এই সময় চন্দ্রকান্তশর্ম্মা নামক এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভিক্টোরিয়া স্কুলে হেডপণ্ডিত হইয়া আসিলেন। রাণীর দীঘির পাড়েই আমার বাসার নিকট তাঁর বাসা। মনের যখন আমার এই অবস্থা, তখন একদিন শুনিলাম চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত গুন্ গুন্ করিয়া গাইতেছেন—"শ্যাম-প্রেম সুখ-সাগরে আমি মীনের মতন ডুবে রইতাম সই।" গান আমার তখনকার ভাব-প্রবণ চিত্তে শেলের মত বিঁধিল, কণ্ঠ স্বরটি কি সুন্দর! এমন সুন্দর স্বর আমি শুনি নাই, বৃদ্ধের কণ্ঠ ঠিক কিশোরীর কণ্ঠের ন্যায়। পণ্ডিত মহাশয়কে ডাকিয়া সেই গান আবার গাইতে বলিলাম, তিনি কৃষ্ণকমলের সেই গানটি সমগ্র গাইলেন। শ্যাম-প্রেমের বড়াই করিয়া জীবন কাটাইয়াছি, শারদ-রৌদ্রের ন্যায় প্রতিকূল ব্যক্তিরা আমাকে দগ্ধ করিয়াছেন—কিন্তু "তখন শ্যাম নবজলধরে থাকত শীতল ছায়া করে,—আমার লাগ্‌ত না সে তাপ গায়" তার পর অক্রূর অগস্ত্য মুনির মত আসিয়া আমার সুখসাগর গণ্ডূষ করিয়া গ্রাস করিলেন, "আমার হরে নিল ইন্দু, শুকাইল সিন্ধু—একবিন্দু না রাখিল।" তখন পণ্ডিতকে বিদায় করিয়া চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিলাম। আমাকে ও ত ভগবান এত স্নেহ এত প্রেম দেখাইয়া সব হরণ করিয়া লইয়াছেন—একবিন্দুও রাখেন নাই।

"রোজ সন্ধ্যাবেলা সপ্ত-রত্ন দেখিতে যাইতাম, কুমিল্লার পূর্ব্বদিকে—প্রায় এক মাইল হাঁটিয়া গেলে এই প্রাচীন মন্দির। তাহাতে যে কেহ

উঠিতে পারেন. কিন্তু নামিবার পথ পাইবেন না। সিঁড়ি গুলি এমনই আড়ালে আছে—যে তাহা নিতান্ত পরিচিত না হইলে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবার নহে। আমি চোখ বুজিয়া উঠা নামা করিতে পারিতাম, যেহেতু রোজই আমি সেই মন্দিরের উর্দ্ধ তলায় উঠিয়া চতুর্দ্দিকের সেই মেঘের কোলে পাহাড়ের দৃশ্য দেখিতাম,—কোন হতভাগ্য উর্দ্ধ চূড়ার স্বর্ণ কলস চুরি করিবার জন্য প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল, সে খুব বড় বড় পেরেক পুতিয়া সেই মন্দির-গাত্র বাহিয়া উঠিয়াছিল। পেরেকগুলি এখনও পোতা আছে, কিন্তু লোক-লোচনের বিষয়ীভূত হইয়া তাহার পদ স্খলন হইয়াছিল —তদবধি বিগ্রহকে সেখানে না রাখিয়া নিকটবর্ত্তী মন্দিরে নেওয়া হইয়াছে। সম্মুখে দীঘি, তাহা এক হাজার এক কলসী গঙ্গা জলে পবিত্র করা হইয়াছিল। সেই দীঘির পার্শ্বে কয়েক খানি কুটির. তাহাতে একটি বৃদ্ধ বৈষ্ণব বাস করিত। আমি সেই সপ্তরত্নের উপরের তলায় উঠিয়া তার কুটিরের দিকে তাকাইতাম, সে একটি সারেঙ্গ কখনও বা একতারা লইয়া আমার কাছে আসিত; সে চণ্ডীদাসের পদ গান করিয়া আমার হৃদয় জুড়াইয়া দিত। "এঘোর যামিনী, মেঘের ঘটা, কেমনে আইলা বাটে, আঙ্গিনার মাঝে বধুয়া ভিজিছে, দেখে যে পরাণ ফাটে,"—এই গানটি সে গাইত, আর কাঁদিত। সে আমাকে ইহার অর্থ বুঝাইয়া দিত। তাহার মনে পাপের অন্ধকার, বাহিরে ভীষণ দুর্য্যোগ, পাপীর কাছে ভগবান নিত্য আসেন, কিন্তু তাঁর পায়ে কাঁকর বিধে, তার শ্রীঅঙ্গ বৃষ্টিতে ভিজিয়া যায়—তথাপি তিনি আমার মন পাইবার জন্য বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করেন।" বৃদ্ধের সুর খুব মিষ্ট ছিল না, কিন্তু তার ভক্তি এত বেশী ছিল—যে সে যখন গাইত, "বঁধুর পীরিতি আরতি দেখিয়া, মোর মন হেন করে, কলঙ্কের ডালি, মাথায় করিয়া, অনল ভেজাই ঘরে"—তখন যেন যেন প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিত, মনে হইত কেন গৃহের

প্রাচীরের ভিতর চিরকাল মাথা খুঁড়িয়া মরিব—তার নাম গান করিতে মুক্ত বায়ুতে বার হয়ে পড়া যাক—লোকে যা বলবার বলুক।

রোজ-রোজই বৃদ্ধের গান শুনিতাম, রোজই তার ভক্তি দেখিয়া ধন্য হইতাম। সে ভক্তি-ধর্ম্মের এরূপ বড় কথা আমাকে বলিত যে আমি অবাক হইয়া যাইতাম, অশিক্ষিত লোকের পক্ষে তাহার চাইতে বিস্ময়কর কিছু কল্পনা করিতে পারি নাই। একদিন এই ভক্তি-মান বৈষ্ণবের কথা বলিয়া চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতকে সপ্তরত্নে লইয়া গেলাম। চন্দ্রকান্ত পাণ্ডতকে প্রথম গান গাইতে বলা হইল, তাঁহার সুকণ্ঠ বীণাধ্বনির ন্যায় সেই নির্জ্জন প্রদেশকে যেন ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিল। তাঁহার সুর মিষ্টত্বের খনি, কিন্তু বৈষ্ণবোচিত ভক্তি তাহাতে বেশী ছিল না। তাঁহার সুর শুনিয়া বুড়ো বৈষ্ণব একবারে ভীত আড়ষ্ট হইয়া গেল—সে কিছুতেই আর গাইতে পারিল না। "দিবা প্রদীপবৎ" তাহার প্রতিভার লোপ পাইল। কিন্তু আমি বুঝিলাম, যে মহাদান সে আমাকে রোজ রোজ দিত,—তাহার কাছে সুরের ঝঙ্কারের মূল্য অল্প।

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুলের খুব ভাল অবস্থা হইল, আমরা কলেজ স্থাপন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলাম।

কলেজ করা ঠিক হইল। আনন্দবাবু আমাকেই প্রিন্সিপাল করিবেন স্থির করিলেন, এবং অপরাপর প্রফেসার নিয়োগ এবং এ্যাফিলিয়েসনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

স্বর্গীয় দীননাথ সেন ইনস্পেক্টার তখন ছিলেন পূর্ব্ব বঙ্গের শিক্ষা বিভাগের একচ্ছত্র সম্রাট, তাঁহার মাথাটা ছিল বড় একটা গোয়ালন্দের তরমুজের মত, এত বড় মাথা খুব কমই দেখা যাইত, এত বড় বুদ্ধিমান লোক ও তখন পূর্ব্ব বঙ্গে খুব কম ছিল। তিনি যখন কুমিল্লা, নোয়াখালি, প্রভৃতি অঞ্চলে আসিতেন, তখন আমার বাসায়ই উঠিতেন। একবার

জেলা স্কুলের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের তদন্ত করিতে আসিয়া আমাদের বাড়ীতে প্রায় পনের দিন ছিলেন, তাঁকে লোকে বাঘের ন্যায় ভয় করিত, কিন্তু আমি শুনিতাম রোজ সন্ধ্যাকালে পূর্ব্বদিকের জানেলাটা খুলিয়া তিনি রাণীর দীঘির নীল জল দেখিতেছেন ও গাইতেছেন "হায়রে দশা কি, তামাসা বাসার জন্য ভাব্‌ছ কেনে। হৃদকমলে দিতে বাসা আশা করে কতই জনে।" সুতরাং বুঝিতাম, ভিতরে ভিতরে রসের ফল্গুধারা এহেন অটুট গাম্ভীর্য্যের শৈল-কঠিন হৃদয় দিয়াও বহিয়া যাইতেছে; গোপাল উড়ের চটুল ভাষায় হীরামালিনীর উক্তি পর্য্যন্ত হৃদয়ে হিল্লোল জাগাইতেছে। তিনি আমায় বলিলেন "দীনেশ, তুমি কি কাণ্ডটা করিতেছ, বল দেখি। শুনিয়াছি রাত নাই, দিন নাই, তুমি এই সকল পাহাড়ে দেশের জঙ্গলে জঙ্গলে পুঁথি খুঁজিয়া বেড়াও,—রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত পুঁথি পড়। চক্ষু দুটি যাবে—নতুবা সাপের মুখে—বাঘের মুখে প্রাণ দেবে। বাঙ্গালা ভাষা কি সত্যই এত বড় একটা জিনিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে এর একটা ইতিহাস লেখা চলে, আর কে সে বই পড়'বে বল দেখি! আমি বাঁচিয়া থাকিতে একখানি পাঠ্য বই লিখে ফেল,—তাতে বেশ দুপয়সা হবে—আর হাড় ভাঙ্গুনি খাটুনি ও খাট্‌তে হবে না" আমি সে কথায় কর্ণপাত করি নাই। পৃথিবীটার সবটা টাকা পয়সার বশীভূত নহে, অন্ততঃ আমার মন্‌টা তখন এমন্ ছিল, যে দুটো মিষ্ট কথায় তাকে ভুলাইতে পারা যাইত, টাকা এমন কি মোহরটাও আমার কাছে কাণা-কড়ির মত মনে হইত। টাকাতে জীবনের কতকটা সুবিধা হইতে পারে—এখন বুঝিয়াছি, কিন্তু তখন তাহা ও বিশ্বাস করিতাম না।

শুধু দীননাথ সেন মহাশয় নহে, বঙ্গভাষাটা যে একটা ভাষাই নয়, ইহাই ছিল তখনকার ধারণা। ইহার আবার একটা ইতিহাসের কোন

মূল্য আছে,—ইহা বন্ধু ও সুহৃদ্বর্গের মধ্যে কেহই বিশ্বাস করিতেন না। সকলেই আমাকে দুহাতে এই কাজ হইতে নিরস্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। শুধু কলিকাতা হইতে মাঝে মাঝে কেহ কেহ উৎসাহ দিয়া চিঠি লিখিতেন এবং দুই একখানা সংবাদপত্র আমার উদ্যমের সুখ্যাতি করিয়া মাঝে মাঝে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশিত করিত। কিন্তু বাহিরের উৎসাহে আমি উৎসাহিত হই নাই, এবং বাহিরের বিরাগ ও প্রতিকূলতায় আমি নিরুৎসাহ হই নাই। আমি বুঝিয়াছিলাম,এই বাঙ্গলাভাষার চর্চ্চাই আমাকে জীবিত রাখিয়াছে, এই কাজ ছাড়িয়া দিলে আমার হাত রিক্ত হইবে, প্রাণ অবলম্বন-শূন্য হইবে এবং যা একটু অবশিষ্ট আনন্দ আছে—তা হারাইয়া হৃদয় হাঁপিয়া উঠিবে। সুতরাং নিন্দা স্তুতি আমার কাছে তুল্য ছিল। কেহ যদি মাতাকে ছেলেটিকে ভাল বাসিতে বলে এবং কেহ যদি নিষেধ করে—তাঁর কাছে সে সকল উপদেশের কোন মূল্য থাকে কি? আমি দিন রাত্রি যে জিনিষ গুলি জপ তপ করিতেছিলাম—কাহারও উপদেশে তাহা বেশী ভাল বাসিতে কিম্বা ছাড়িয়া দিতে আমার শক্তি ছিল না।

টাকার আবশ্যই দরকার হইয়াছিল, পুস্তক ছাপিতে। গ্রীয়ার সাহেব তখন ত্রিপুরার ম্যাজিষ্ট্রেট, তাঁহার নিকট হইতে সুপরিশি চিঠি লইয়া হস্তী-পৃষ্ঠে আগরতলা গেলাম। তখন রাধা রমণ ঘোষ মহাশয় ত্রিপুরার ষ্টেটে সর্ব্বে সর্ব্বা। আমি মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের সাক্ষাৎ কারের প্রার্থী হইয়া এত্তেলা দিলাম। মহারাজা আমার খাওয়া দাওয়ার খুব রাজোচিত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আজ কাল করিয়া দেখা করিতে দেরি করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে পূর্ব্ব বঙ্গের সুবিখ্যাত মল্লবীর শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (যিনি শেষে "সোহং স্বামী" নামে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন) একটা বন্য ব্যাঘ্র লইয়া আগরতলায় আসিয়া উপস্থিত।

শ্যামাকান্ত অতি সুপুরুষ ছিলেন। যদিও তাঁহার বক্ষে অত্যন্ত গুরুভার পাথর পিটিয়া ভাঙ্গা হইত, এবং কুস্তি, ঘুষি, হাতাহাতি-যুদ্ধ এবং দৌড়-ধাপে সাহেবদের মধ্যেও কেহ তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না, তথাপি তাহার চেহারা দেখিলে ভয় হইত না, বরং ভালবাসিতে ইচ্ছা হইত। বিশাল দুই চক্ষু, মুখ খানি প্রতিভাপূর্ণ, কথা গুলি তেজঃপুঞ্জ; দেখিলেই মনে হইত প্রতিভাশালী পুরুষ। শ্যামাকান্ত আমা অপেক্ষা বড় ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা শশীবাবু আমার অপেক্ষা আড়াই গুণ বেশী বয়স হইলেও আমি তাঁহারই বন্ধুত্বাভিমানী ছিলাম। শশীবাবুর চেহারাটি ছিল অনেকটা বঙ্কিম বাবুর মত। বহু লোকে তাঁকে বঙ্কিম বাবু বলিয়া ভুল করিত। তিনি বঙ্কিমবাবু হইতে একটু খর্ব্বকায় ছিলেন।

শ্যামাকান্ত ত্রিপুরা-সরকারে আগে কাজ করিতেন, তার পর বাঘ ভালুক পোষ মানাইয়া সারকাশ করিয়া বেড়াইতেন। উইলসন সারকাশে তিনি দুই এক বছর ১৮০০৲ টাকা মাসিক বেতনে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি এবার আগরতলায় আসিয়া আমাকে বলিলেন—"তুমি এখানে কত দিন?" আমি বলিলাম। "এই পনের দিন, রাজার সাক্ষাৎ পাচ্ছি না, অতিশয় ভদ্রতা সহ তিনি দিন ক্রমাগত পিছাইয়া দিতেছেন! তোমাকে ও ভাই কিছু কাল থাক্‌তে হবে! আজ এসেই কি দেখা পাবে?"

শ্যামাকান্ত হাসিয়া বল্লেন, "আমি! তুমি পাগল—আমি তোমার মত বসে থাকব নাকি?"

আমি বলিলাম—"সাহেবেরা এসে ও যে সহজে দেখা পান না!" শ্যামকান্ত হাসিয়া বলিলেন—"সে দেখা যাবে।" তার পর তিনি কোথায় বাসা করে আছেন, জিজ্ঞাসা করিলাম। উত্তরে তাহার অভ্যস্ত

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিলেন—"ভাই, আমি পরের বাসায় উঠে কতগুলি ভাত ডাল, আর মিষ্টি খেয়ে লম্বোদর হয়ে বসে থাক্‌বার ছেলে নই, বিশেষ, সঙ্গে একটা বাঘ আছে—আমার কাছে আসার পূর্ব্বে সে নরমাংস খেয়ে জীবন যাত্রা চালাত—তাহার আতিথ্য করবে কে? আমি তাঁবু খাটীয়ে আছি, রোজ বড় দেখে একটা ছাগল কিনে আনি, তার অর্দ্ধেকটা বাঘকে খাওয়াই আর অর্দ্ধেকটা উনুনে আধ-সিদ্ধ করে নিজে খাই—শাক সবজির মত দুটো ভাত—খেলে ও চলে না খেলে ও চলে।"

তার পরদিন শুনিলাম, মহারাজার নিকট হইতে ২০০৲ টাকা আদায় করিয়া শ্যামাকান্ত চলিয়া গেছেন। ঘটনাটী হইল এইরূপ; মহারাজার প্রাসাদে সিঁড়ির কাছে মণিপুরী সৈন্য সঙ্গিন লইয়া পাহারা দেয়, শ্যামাকান্ত তার ভীষণ-দর্শন একটা কুকুর লইয়া সেই সিঁড়ির কাছে উপস্থিত হয়। রাধারমণ বাবু বলিলেন "মহারাজার সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ হবে না" সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া সে কুকুর সহ সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে থাকে. মণিপুরী সশস্ত্র প্রহরী তাহাকে বাধা দেয়—তখন তাহাদের দুই তিন জনের সঙ্গীন কাড়িয়া লইয়া সে সেখানে একটা বিষম হল্লা বধাইয়া দেয়—কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করিয়া প্রভুর পক্ষ সমর্থন করিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে থাকে। এই অশ্রুত-পূর্ব্ব কলরবে প্রাসাদের সকলে শঙ্কিত হইয়া ওঠে। মহারাজ "কি হইয়াছে?" জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান এবং যখন ঘটনাটি শুনিলেন, তখন রাধারমণ-বাবুকে বলিলেন—"ওর ভয়ে আমি সর্ব্বদা অস্থির থাকি, ওকে কেন ঠেকিয়া রাখ্‌লে—আসতে দাও।" শ্যামাকান্ত যাইয়া মহারাজাকে বলিল "মহারাজ, আমি বাঘের মুখে হাত ঢুকাইয়া তাহা ফিরিয়া আনিতে শিখিয়াছি, নরখাদক ভীষণ বাঘকে পোষ মানাইয়াছি। মহরাজকে খেলা দেখাইব—আদেশ করুন।" মহারাজ বলিলেন "তুমি কি চাও

বল, আমি বাঘের মুখে ব্রহ্ম-হত্যা দেখতে মোটেই রাজী নই, তুমি কি হ'লে আমায় ছাড়বে তাই বল।" শ্যামাকান্ত বলিল, "মহারাজ, আমি আপনাকে খেলা দেখাব বলিয়া এত দূর আসিয়াছি, সে আশা যদি পূর্ণ না করেন, তবে আমার এই থলিয়াটি পূর্ণ করিয়া দিন, ইহাতে হাজার দুই টাকা ধরিতে পারে।" মহারাজা তখনই দুই হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়া দিলেন। শ্যামাকান্ত মিলিটারী কায়দায় মহারাজকে সেলাম করিয়া এবং ডান হাত উঠাইয়া ব্রাহ্মণের মত আশীর্ব্বাদ-সূচক বৃদ্ধাঙ্গুলী কর-তলে ঠেকাইয়া টাকা লইয়া চলিয়া গেল।

আর দুই দিন পরে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য আমাকে দেখা করিতে অনুমতি দিলেন—সাক্ষাৎকারের যে বিলম্ব, কিন্তু দেখা দিলে দয়ার অবধি নাই। দ্বারদেশে ভিঁড়, গোলমাল ও নিষেধ বিধি—ইত্যাদি কিন্তু ভিতরে আনন্দ-লোক। মহারাজ আমার সমস্ত খরচ দিবেন, আদেশ দিলেন, বই তাঁরই নামে উৎসর্গ করিতে অনুমতি চাহিয়া লই-লাম। আগরতলা অবস্থান কালে আমার কলেজ সুহৃৎ অশ্বিনী কুমার বসু এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শশীভূষণ বসু আমাকে বিশেষ আদর অভ্যর্থনা ও সহায়তা করিয়াছিলেন। তখন মহারাজার ত্রিপুরার দেওয়ান ছিলেন রাজমোহন মিত্র, ইনি অত্যন্ত প্রতাপশালী ব্যক্তি ও সজ্জন ছিলেন। তখন শিশির বাবুর "অমিয়নিমাই চরিত"সবে মাত্র বাহির হইয়াছে। আমি এক এক দিন সন্ধ্যাকালে দেওয়ানজীর বাড়ীতে গেলে তিনি আমাকে ঐ বই পড়িয়া শুনাইতে বলিতেন। আমি পড়িতাম ও অনেক ভদ্রলোক সেই খানে বসিয়া সেই পাঠ শুনিতেন। ইহারা তাঁহারা সকলে একটু গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন, অমিয়-নিমাই চরিতের ভক্তির দিকটারই উপরে সকলে জোর দিতেন, উহার ঐতিহাসিক দিক্‌টার প্রতি কেহই লক্ষ্য করিতেন না।

আমাদের দেশের সাধারণ লোক কোন মহাপুরুষ সম্বন্ধে যে গল্পই হউক না কেন, তাহা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সত্য এবং অসত্যের মধ্যে তাঁহারা অনেক সময় কোন প্রভেদ দেখেন না। পৌরাণিক যুগের ভক্তির মানদণ্ডই ছিল তাঁহাদের এক মাত্র লক্ষ্য। কত লোক ত চারিদিকে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, ইহাদের কে হাঁচিল, কে কাশিল তাহা খাটি ঐতিহাসিক সত্য হইলেও ভক্তের নিকট তাহার জানার কি দরকার? কে খাঁড়া ধরিয়া তার সহোদরের শিরোচ্ছেদ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিল, কিম্বা জিজিয়া টেস্‌ক বসাইল—তাহার আলোচনা ভক্তের নিকট একান্ত নিস্ফল। কিন্তু মহাদেব যখন সমস্ত জগত রক্ষার জন্য গণ্ডূষ করিয়া সিন্ধুময় গরল পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইলেন, কিম্বা একটা বৃহৎ নগরীকে ক্রূদ্ধ দেবরাজ-প্রেরিত বন্যার মুখ হইতে বাঁচাইতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর উপর গোবর্দ্ধন গিরিটাকে ধরিয়া সেই ক্রোধের গগন-ভেদী বর্ষণ ও স্ফূরণ ব্যর্থ করিয়া দিলেন—তখন দেবগণের দয়ার কথা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ ভক্তি-বিমূঢ় ও অশ্রু-প্লাবিত হইয়া গেল। এই কাহিনী বিশ্বাস করিয়া তাহার হৃদয় ভক্তি-গঙ্গার বিধৌত হইয়া গেল—অথচ এসকল কথা—সত্যের ত্রিসীমায় আসিয়া পৌঁছে না, পৌরাণিক গল্পগুলি একান্তরূপে ইতিহাস। বিরোধী-পৌরাণিক যুগে আমাদের ঐতিহাসিক বিবরণের প্রতি একান্ত তাচ্ছিল্য এবং দেবলীলার প্রতি সশ্রদ্ধ অনুরাগ এই কারণে ঘটিয়াছিল। যে কাহিনী চোখের জল আনিতে পারে, নিত্য-ধামের আনন্দ-লোকের আভাষ দেয়, মানুষকে সংসারের জ্বালা যন্ত্রনা ভুলাইয়া পর-কুৎসা ও আত্মগৌরব, অনেক সময় যাহা ইতিহাসের ছদ্মবেশে উপস্থিত হয়, তাহার প্রতি হৃদয়কে একবারে বিমুখ করে—তাহাই ছিল সে কালের লক্ষ্য। মানুষ তখন নরলীলা শুনিতে চায় নাই, দেবলীলা শুনিতে চাহিয়াছে।

সুতরাং সম্ভব ও অসম্ভব এই দুইটা জিনিষ তখন নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে একান্ত ভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়ে নাই। ভক্তিই ছিল—তখনকার একমাত্র মাপকাটি। এখনও বঙ্গীয় পল্লী গুলিতে সেই পৌরাণিক যুগেরই জের চলিতেছে এবং মহাপুরুষদের সম্বন্ধে নানারূপ আজগবী গল্পের সৃষ্টি হইতেছে। উত্তরাধিকার-সূত্রে লব্ধ চিরন্তন সংস্কারের হাত এড়াইতে না পারিয়া এখনও কলেজের কোন কোন পড়ুয়া "There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy" সেক্ষ-পীয়রের এই গৎ আওড়াইয়া সেই সকল গল্প-গুজব সমর্থন করিতেছেন।

রাজমোহন মিত্র মহাশয়ের দুই পুত্র যোগেন্দ্র ও উপেন্দ্রের সঙ্গে আমার সেই সময় যে সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল—তাহা এতকাল পরেও স্নেহ-রস-সিক্ত হইয়া এখনও আমার হৃদয় অধিকার করিয়া আছে। উপেন্দ্র এখন কুমিল্লার উকীল-সরকার।

মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটরী রাধারমণ ঘোষ মহাশয়ের ভ্রাতা প্রাণচৈতন্য ঘোষ, বি, এল কুমিল্লায় একটি প্রেস খুলিয়াছিলেন। তাঁহারই চৈতন্য-প্রেসে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে"র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

কিন্তু পুস্তক প্রকাশ হইবার অব্যবহিত পরেই, অর্থাৎ ১৮১৯৬ সনের ৬ই নবেম্বর তারিখে, আমি কুমিল্লা পাবলিক লাইব্রেরীতে বসিয়া ছিলাম, এমন সময়ে মনে হইল আমার মাথা ও শরীরে কিরূপ একটা অসহ্য উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছে। উহা কোন অঙ্গের বেদনা বা জ্বালা-পোড়া নহে, অথচ সমস্ত শরীর ও মন যেন আমার হাত হইতে চলিয়া যাইতেছে, —মনের ভাবগুলি যেন আর আয়ত্ত নাই—এরূপ বোধ করিলাম।

আকাশে সাইক্লোন হইবার পূর্ব্বে যেরূপ দুর্যোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়—আমার মস্তিষ্ক ও সমস্ত শরীরে সেইরূপ একটা বিপদ-সূচনা অনুভব করিলাম। বাসায় ফিরিয়া আসিলাম—তখন দেশে কোটা বাড়ী তৈরী করিব, তাহার নক্সা তৈরী হইয়াছিল। ভিক্টোরিয়া স্কুলের স্বত্বাধিকারী আনন্দ বাবু সাহায্য করিবেন স্থির হইয়াছিল। আমার পিতা বিম-বরগা ও ইষ্টক কিনিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন—সুতরাং ব্যয়-বাহুল্য কিছুই হইবার কথা ছিল না। কেরানী লোকনাথ বাবুকে তিন চার মাসের ছুটি দিয়া দেশে পাঠাইব, আনন্দ বাবু স্বয়ং এই ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। বাসায় আসিয়া দেখিলাম, লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নক্সা হাতে বসিয়া আছেন, আমি তাঁহাকে বলিলাম; "বাড়ী আর হইল না, আপনি আনন্দ বাবুকে বলুন—আমি পীড়িত, তিনি একবার আমায় আসিয়া দেখিয়া যাউন।" আনন্দ বাবু আসিলে বলিলাম "আপনি আর একজন হেডমাষ্টার খুঁজুন, আপনার ভাবী কলেজের প্রিন্সিপাল আমি হইতে পারিব না" এই বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলাম। তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন? আমি কিছু না বলিতে পারিয়া বিছানায় যাইয়া শুইয়া পড়িলাম। এতদিন প্রানান্ত পরিশ্রম, কলহ-অশান্তি, শোক ও মর্ম্মবেদনার ফল আজ ফলিল। এত দীর্ঘকালের রাত্রিজাগরণ, সময় সময় পাহাড় পর্ব্বতে অনাহারে ১৪।১৫ মাইল পর্য্যটন, এবং শরীরের প্রতি একান্ত নিগ্রহ ও অত্যাচারের ফল আজ ফলিল। আমার চক্ষু হইতে নিদ্রা চলিয়া গেল, আহারের রুচি চলিয়া গেল, লিখিবার পড়িবার ক্ষমতা গেল, স্মৃতি-ভ্রংশ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক ও মনের সমস্ত বল হারাইয়া নিশ্চেষ্ট জড়পিণ্ডবৎ বিছানায় পড়িলাম। আনন্দ বাবুর সাহায্যে কুমিল্লায় যতটা চিকিৎসা চলিতে পারে—তাহা

হইতে লাগিল। তখন কুমিল্লার শ্রেষ্ঠ ডাক্তার ছিলেন প্রকাশ চন্দ্র সেন, তাহা ছাড়া ফ্রান্সিস্ সাহেব—এ বি, রেলওয়ের বড় ডাক্তার ও আমার বন্ধু ছিলেন। মহিম চন্দ্র দাসগুপ্ত ছিলেন বড় কবিরাজ, তাঁহার পুত্র উপেন্দ্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র তারক ছিল আমার ছাত্র। এখন উপেন্দ্র আলিপুর কোর্টের একজন সর্ব্ব প্রধান উকিল। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন, শশীবাবু, ইহাঁরা পর্য্যায় ক্রমে আমাকে চিকিৎসা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ কোন উপকার পাইলাম না। আমায় ধরিয়া তুলিয়া বসাইতে হইত। আমার আত্মীয় হরিকুমার দত্ত জজের নাজির মহাশয় কয়েক জন আদালতের পিয়ন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। দিনরাত্রি তাহারা আমার পরিচর্য্যা করিত। আমার স্ত্রী অসমর্থ অবস্থা সত্ত্বে ও সারারাত্রি আমায় বাতাস দিতেন, আমার তো এক মুহূর্ত্তের জন্ম ও সারারাত্রি ঘুম হইত না। আমার পরিচর্য্যায় নিরত থাকিয়া তিনি ও রাত্রে ঘুমাইতে পারিতেন না। কোন শিশুর চীৎকার, পাখীর ডাক শুনিলে আমি অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করিতাম, কবিরাজ মহাশয়েরা দিন রাত্রি বরফের অভাবে আমার মাথায় ঘৃত-কমল বাঁধিয়া রাখিতেন। তখন কিরণের বয়স ৪ বৎসর হইবে, একদিন একটা বড় বেলের কাঁটা তার পায়ের গোড়ালীতে এতটা ফুটিয়া গিয়াছিল যে তাহা টানিয়া বার করাতে এক গামলা জল রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পাছে তার চীৎকার শুনিয়া আমার ব্যারাম বাড়িয়া যায়, এই ভয়ে সেই চার বছরের শিশু এত যন্ত্রণা সহিয়া ও টু শব্দটি করে নাই। ক্রমাগত পাঁচ সাত দিনরাত্রি একবারে অনিদ্রা অবস্থায় কাটাইয়া আমি এরূপ উৎকট কষ্টবোধ করিয়াছি যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি, "আধ ঘণ্টা ঘুমাইতে দিয়া আমায় মারিয়া ফেল।" মাথার অবস্থা এত খারাপ হইয়াছিল যে একদিন কাগজি নেবুর নাম স্মরণ করিতে যাইয়া কপাল হইতে ক্রমাগত স্বেদ বিন্দু পড়িয়া

আমি অজ্ঞানের মত হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং আর একদিন হোমিও-প্যাথিক ডাক্তার শশীবাবু নাড়ী ধরিয়া আমার কাছে বসিয়াছিলেন, আমি তাঁহার দাড়ী ধরিয়া গালে চড় মারিবার জন্য একটা দুর্দ্দমনীয় লোভ অনুভব করিতেছিলাম। সত্যই আমার সমস্ত চেষ্টা অতিক্রম করিয়া ডান হাত খানি তাঁহাকে মারিবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিয়াছিল—তখন উৎকট মানসিক চেষ্টা দ্বারা সেই ব্যাপার হইতে ক্ষান্ত হইয়াছিলাম।

ইহার পরে আনন্দবাবু আমার স্ত্রী পুত্রাকন্যাদিগকে আমার শ্বশুর-বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া আমাকে তাঁহার নিজ বাড়ীতে লইয়া গেলেন, এবং আমার আরোগ্যের জন্য নানারূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। একদিন প্রকাশ ডাক্তার মহাশয় আমার অনিদ্রা রোগের জন্য মরফিয়া ব্যবস্থা করিলেন—ইহার পূর্ব্বে ব্রোমাইড ও সালফোনাল দিতেন, মরফিয়া খাওয়ার পর আমি সারা-রাত্রি যে ভাবে কাটাইয়াছিলাম—সেরূপ দুঃসহ কষ্ট বোধ হয় জীবনে অতি অল্পই ভোগ করিয়াছি। পরদিন শুইয়া আছি, আমার মনে হইল কেউ যেন রাস্তায় দৌড়িয়া যাইতে আমাকে বাধ্য করিতেছে, আমি উঠিয়া বসিলাম—ভগবানকে প্রাণপণে ডাকিতে লাগিলাম এবং বলিলাম, "হে ঈশ্বর আমায় পাগল কোরো না, আমাকে অন্ধ কর, কুষ্ঠ রোগ দাও, কিন্তু মানুষ হইয়া যেন পশু হইয়া না থাকি।" আনন্দ বাবুর কাছে কাঁদিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন "আপনি কি করিয়া পাগল হইবেন? কাউকে এমন দেখিয়াছেন কি যে বিছানায় পড়িয়া পাগল হয়? আপনার উঠিয়া বসিবার শক্তি নাই, এমন অবস্থায় কেউ কি কখন পাগল হইয়াছে, শুনিয়াছেন?" এই কথা শুনিতে শুনিতে আমি উৎকট যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিলাম—হাত মুষ্টি-বদ্ধ হইল, দাঁতি লাগিল এবং অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। কতক্ষণ এইভাবে ছিলাম মনে নাই, জাগিয়া দেখি ডাক্তার কবিরাজে ঘর ভর্ত্তি। তারপর

হইতে শরীরও মস্তিষ্ক খুব খারাপ হইলে ঐরূপ ফিট হইতে লাগিল, দিনে ৩।৪ বার করিয়া ফিট হইত। ফিটের পরে একটু উপশম বোধ করিতাম।

তার পর আমার স্ত্রী অত্যন্ত উতলা হওয়াতে আমাকে আনন্দবাবু আমার বাসায় পাঠাইয়া দিলেন এবং আবার স্ত্রীপুত্রকন্যার সঙ্গে মিলিত হইলাম। আমার পীড়ার খবর পাইয়া আমার মাসতুত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কুমিল্লায় আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া আমার প্রাণ জুড়াইয়া গেল—মনে হইল যেন অর্দ্ধেক ব্যারাম কমিয়া গিয়াছে।

এই সময় হইতে আমি জপ আরম্ভ করি। এমন নিশ্চেষ্ট, এমন অকর্ম্মণ্য আমার মত আর কে আছে? এমন উত্থান শক্তি রহিত এমন একান্ত রূপ স্বশক্তির উপর নির্ভরের অযোগ্য আর কে? সুতরাং তাঁহারই উপর নির্ভর করিতে লাগিলাম। রাত্রে ঘুম হইত না, না হইল—অমৃতের খনির সন্ধানে রাত্রি জাগিয়া কাটিতাম, কাশীদাসের মহাভারতের সূচনায় আছে,"সর্ব্বশক্তি বীজ হরি নাম দ্বি অক্ষর","হরে নামৈ্ব কেবলম্" শাস্ত্রের উক্তি। এই নামের উপর নির্ভর করা ছাড়া আমার আর কি শক্তি ছিল? যখন দুশ্চিন্তাও নৈরাশ্যে হাঁপাইয়া উঠিতাম—দুর্ভাবনার ব্যূহ ভেদ করিয়া মন বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া পাইত না,তখন করজোড় করিয়া নাম জপ করিতাম; আমার মনের সমস্ত—দুর্য্যোগ আস্তে আস্তে কাটিয়া যাইত। চণ্ডীদাসের "কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম" ছত্র মনে পড়িলে চোখ দিয়ে জল পড়িতে থাকিত। তখন মনে হইল, সংসারে হীরা পাইয়াছিলাম তাহা ছুড়িয়া ফেলিয়া কেন কাচ লইয়া উন্মত্ত হইয়াছিলাম, "হরি হরি," বলিতে প্রকৃতই অপূর্ব্ব শান্তি পাইতাম। মনে স্থির করিলাম এবার ভাল হইলে তাঁহারই পাদপদ্ম আশ্রয় করিব—এই সংসার আর আমাকে আবদ্ধ করিতে পারিবে না, যাহাদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছি

পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিয়া তাহাদের সঙ্গে বিবাদ মিটাইয়া যাইব। শান্তি দ্বারা অশান্তিকে ধ্বংস করিব, প্রেম দ্বারা ইন্দ্রিয় বিজয় করিব পর্ব্বত ও সমুদ্র, মরুভূমি ও উপত্যকা, নগর ও গ্রাম এসমস্ত জুড়িয়া ভগবানের পাদপদ্ম পড়িয়া আছে, আমার চক্ষে সমস্তই তীর্থ,—এই তীর্থে মহানকে দেখিব, সুন্দরকে দেখিব, তাঁহার ভৈরব শঙ্খনিনাদ শুনিব, তাঁহার সুমিষ্ট বাঁশী শুনিব, তাঁহার করপদ্ম লগ্ন পঙ্কজের সুবাসে প্রাণ জুড়াইব।

আমার মন এক ধাপ উঁচুতে উঠিল, বুঝিতে পারিলাম। বুঝিলাম আমার রোগ এইবার সারিয়া যাইবে।

এই উৎকট পীড়ার সময় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" যে ভাবে শিক্ষিত সমাজে গৃহীত হইল—তাহা আমার পক্ষে বিশেষ গৌরবের কথা। অযাচিত ভাবে কলিকাতা হইতে রাশি রাশি প্রশংসার অতিশয়োক্তি আসিতে লাগিল। রবীন্দ্রবাবু, রামেন্দ্রবাবু, হীরেন্দ্রবাবু, নগেন্দ্রবাবু পুস্তকখানির বিশেষ প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিলেন। রামেন্দ্রবাবু অতি অল্পভাষী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার লেখনী ছিল ঘোর মুখরা—তিনি আট পৃষ্ঠা ভরিয়া এত প্রশংসার কথা লিখিলেন যে আমি কতকটা লজ্জিত হইলাম। সাহিত্য পত্রিকায় হীরেন্দ্রবাবু সুদীর্ঘ সমালোচনা করিলেন, নব্য ভারতে ক্ষীরোদচন্দ্র রায়ের অভিনন্দনটি খুব হৃদয়গ্রাহী হইল। রামানন্দ চট্টো-পাধ্যায় মহাশয়ের দীর্ঘ সমালোচনা প্রদীপ পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতা রিভিউ এবং আর একখানি পত্রিকায় বিস্তৃত ভাবে ইংরেজীতে সমালোচনা করিলেন। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইলে রবীন্দ্রবাবু বঙ্গদর্শনে অতি বিস্তৃত গবেষণা-মূলক সমালোচনা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামের কমিশনার এফ্‌ এচ্‌ ক্রাইন অতি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া আমার অসুস্থতার জন্য সমবেদনা জানা-ইলেন এবং ডিরেক্টার মার্টিন সাহেবকে আমার সম্বন্ধে নানারূপ অনুরোধ

করিয়া চিঠি লিখিলেন। অনেক প্রসিদ্ধ লেখকের প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনা বাহির হইতে লাগিল এবং মাসিক ও সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রগুলিতে আমার পীড়ার কথা লইয়া অনেক সহানুভূতির কথা প্রকাশিত হইল।

আমি পাড়া-গাঁয়ের লোক—কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবি, সমালোচক ও সম্পাদকের নামের মোহ আমার কাছে কম ছিল না। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমি সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়া কতকটা গৌরব অবশ্যই বোধ করিয়া ছিলাম, কিন্তু তখন আমি একবারে উত্থান-শক্তি রহিত, অপগণ্ড শিশুর ন্যায় পরের উপর নির্ভরশীল। ক্ষণভঙ্গুর দেহ লইয়া মানুষের গৌরব করিবার কি আছে? এক সময় মনে হইত, এই লোক-প্রশংসা ও যশের মূল্য কি? এই সাংসারিক প্রতিষ্ঠার সোনালী রঙের পর্দ্দাটা সরাইয়া দেখিতাম—উহাও ছেলে ভুলাইবার—খেলা দেওয়ার একটা চাতুরীমাত্র। কখন কখনও সারারাত্রি জপ করিতাম—তখন আঁধার কাটিয়া যেন উষার সোণার আঁচল চোখে ঠেকিত;—ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতাম, আমার খেলনা গুলি সোনা রূপার মোড়ক দিয়া আর লোভনীয় করিয়া আমায় প্রলুব্ধ করিও না—আমাকে তোমার পায়ের কাছে একটুকু জায়গা দাও। মনে স্থির করিয়াছিলাম, ভাল হইলে সন্ন্যাসী হইব। ইহার একটি বর্ণও মিথ্যা নহে, ভগবানের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, মনুষ্যও সমাজও জীব-জগতের সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ, আমার প্রকৃত পথ কি? ইহা ভাল করিয়া বুঝিবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিব। জলের মধ্যে হাবুডুবু খাইয়া নদীর রূপ মানুষ বুঝিতে পারে না, ডাঙ্গায় উঠিয়া নদীর মূর্ত্তি ধরা পড়ে, আমি সংসারের বাহিরে যাইয়া সংসারকে চিনিব,দরকার হয় পুনরায় সংসারে ফিরিব, কিন্তু নিজের গন্তব্য পথ আবিষ্কার করিবার পূর্ব্বে নহে।

পীড়া যখন ছয় মাসেও সারিল না, তখন অর্দ্ধবেতনে আনন্দবাবু

আমাকে দেড় বছরের ছুটি মঞ্জুর করিয়া দিলেন। ছয় মাসের ছুটি পূর্ণ বেতনেই পাইয়াছিলাম।

চাঁদপুর আসিয়া ডিপুটি প্রকাশ চন্দ্র সিংহ সুহৃদরের আনুকূল্যে এক খানা বজরা পাইলাম, তাহাতে রাত কাটাইয়া দিলাম। পদ্মার অবাধ-গতি উর্ম্মি কল্লোলে—শন্ শন্ বায়ুর শব্দে আমার বহুদিনের বিনিদ্র অক্ষি-পুট বুজিয়া আসিল। ছয় মাস পরে মাতৃক্রোড়ে শিশুর ন্যায় পদ্মাগর্ভে বজরায় আমি ঘুমিয়া পড়িলাম। যদিও ফ্রান্সিস সাহেব আমায় বলিয়াছিলেন 'তোমার মস্তিষ্ক আর ভাল হইবে না,' তথাপি সেদিন মনে হইল ভাল হইলেও হইতে পারি।

পরদিন অশ্রুপূর্ণ চক্ষে স্ত্রীপুত্রদিগের নিকট বিদায় লইলাম। আমার মাসতুত ভাই গিরীশ চন্দ্র আমার স্ত্রীপুত্রদিগকে লইয়া বরিশাল চলিয়া গেলেন। সেখানে আমার জ্যেষ্ঠ (মাসতুত) ভ্রাতা জগদীশচন্দ্র ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট. তাঁহারই কাছে পরিবার থাকিবে, আমি কলিকাতায় থাকিয়া চিকিৎসা চালাইব। কিন্তু পদ্মার পাড়ে বিদায়ের সময় মনে হইল, হয়ত এই শেষ দেখা, হয়ত আর সারিব না। আমি একান্ত নিঃস্ব, আনন্দবাবু মাসিক ৪০৲টাকা দেবেন,তাহাতে কি করিয়া চিকিৎসা চলিবে? এ পীড়া হয়ত আর ভাল হবে না, কতকটা ভাল হইলেও যে আর কাজ কর্ম্মের যোগ্য কখনও হইব না। পীড়া হইবার ছয় মাস পূর্ব্বে আমি স্ত্রীকে বলিয়াছিলাম "দেখ, বেতন, প্রাইভেটে টিউসন, পরীক্ষকের ফি প্রভৃতি লইয়া আমার মাসিক আয় দেড়শত টাকার বেশী নহে, একটি কপর্দ্দকও বাঁচাইতে পারি না, যদি দুমাস পড়িয়া থাকি তবে সংসার চলিবে কিসে?" এ কিন্তু শুধু দুমাসের সমস্যা নহে। ক্ষুদ্র খাল কল্পনা করিয়া ভয় পাইয়াছিলাম, এ যে সত্যই সমুদ্রে আসিয়া ডুবিলাম। স্ত্রীপুত্রদের সঙ্গে হয়ত আর দেখা হইবে না। হয়ত একাকী কোথায় প্রাণ

যাইবে। আমার বিচ্ছেদ-বিধুর প্রাণের স্পন্দন কি করিয়া বুঝাইব? সম্মুখে বিস্তৃত পদ্মা, আমি তাহার বক্ষে একা। পদ্মা আমার নৌরাশ্যের গভীর অনন্ত আলখ্যের ন্যায়, ঘোর তিমিরাবৃত দুঃখ-তরঙ্গশালী অদৃষ্টের ন্যায়, আমি যেন একা তার মধ্যে ভাসিলাম।

তখন প্রাণপণে হরি নাম আঁকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম; কখনও দুশ্চিন্তায় দুঃখে মন উতলা হইত, যখন, কিরণ ও অরুণের মুখ মনে পড়িয়া চক্ষে জল আসিত,তখনই ফিট হইত। কিন্তু সেই বিপদে আমি ভগবানের নাম আশ্রয় করিয়া রহিলাম। আমার স্ত্রীপুত্র নাই,আমার পিতা মাতা নাই। বিশাল আলেখ্য হইতে বহুদিনের আঁকা স্নেহমমতার নানা রংএ ফলানো সমস্ত ছবি যেন মুছিয়া গিয়া বিশাল শূন্য পটে শুধু এক হরি নাম আঁকা রহিল, অন্য সমস্ত দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া সেই দিকে বদ্ধ-লক্ষ্য হইয়া রহিলাম। অসহ্য সাংসারিক যন্ত্রনা উপস্থিত হইলে আমি কোন চিন্তা করিতাম না। চিন্তা ছাড়া চিন্তা দূর করিতে পারিতাম না, চিন্তা জালে আরও জড়াইয়া পড়িতাম, পীড়া বাড়িত, ফিট হইত। নিজের শক্তি দ্বারা মনকে প্রকৃতস্থ করিবার শক্তি হারাইয়াছিলাম, তাহা বুঝিতে পারিতাম। শিশু যেমন ভয় পাইলে মায়ের গলা জড়াইয়া ধরে, আমি সেই-রূপ উপায়হীন হইয়া নামকে আশ্রয় করিয়াছিলাম। সে নাম কার, তিনি কি করিতে পারেন, তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি, এ সকল ভাবিতাম না। কিন্তু নামই সর্ব্বস্ব, একমাত্র সম্বল এই ভাবিয়া জপ করিতাম, রাতদিন জপ করিতাম, চোখের প্রান্তে অশ্রু গড়াইয়া পড়িত।

এই ভাবে কলিকাতায় ৮৫।২ মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীটে মাতুলালয়ে আসিয়া পড়িলাম। বাড়ী খানি বেশ বড় এবং এত সুন্দর যেন একখানি ছবির ন্যায়। উপরকার হলটি মারবেল দেওয়া, নানারূপ আসবাব পূর্ণ, সেই ঘরে স্থান পাইলাম। মাতুল চন্দ্র মোহন ও শ্রীমোহন তখন উভয়েই কলি-

কাতায়, তখন তাহাদের ঋণ দশলক্ষ টাকার উপরে উঠিয়া সর্ব্বস্ব যায় যায়। যেন ভরা গাঙ্গে ঝড় উঠিয়াছে, নৌকাখানি ডুবু ডুবু।

কলিকাতায় আসিয়া ৭।৮ দিন বেশ ছিলাম। আমি আসিয়াছি, সংবাদ শুনিয়া কলিকাতায় অনেক লেখক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন, রামেন্দ্র বাবু ও হীরেন্দ্র বাবুকে এই ভাবে প্রথম দেখিলাম। সুরেশ সমাজ পতির সাহিত্যে অনেক লিখিয়াছি, তিনি আসিয়া বন্ধুদের অনেকে প্রতিশ্রুতি দিয়া গেলেন। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় আসিলেন। নগেন্দ্রবাবুকে আমরা বড় ভাল লাগিল, অনাড়ম্বর মিষ্ট-ভাষী ও সচ্চরিত্র। সেই দিন হইতে তাঁর অনুরাগী হইয়া পড়িলাম—সে ১৮৯৭ সনের মার্চ্চ মাসে, তদবধি আজ পর্য্যন্ত সেই ভ্রাতৃ-ভাব চলিয়া আসিতেছে। তখন তিনি তেলী পাড়ার একটা ভাঙ্গা বাড়ীতে থাকিতেন, বিশ্বকোষ তখন বোধ হয় 'ট' বর্গে পৌঁছিয়াছে। তখন তাঁর প্রেস ছিল না। আর্য্য প্রেসে 'বিশ্বকোষ' ছাপা হইত এবং তখনও কায়স্থ-আন্দোলন জাগিয়া ওঠে নাই। শ্যামপুকুর লেনে ঢুকিতে ডান দিকে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপর যে এক-তল বাড়ীখানি—তাহাতেই পরিষৎ বসিত। তখনও হীরেন বাবু তাঁহার "সুয়ো রাণী" থিউসফির উপর পক্ষপাতিত্ব দেখান নাই। "সুয়োরাণী" অর্থাৎ পরিষৎ তখন তাহাকে সমগ্র ভাবে পাইত। তিনিই পরিষদের তখন প্রধান বীর ছিলেন।

প্রতিভা ও অনুরাগের গাণ্ডীব লইয়া তিনি, রাজা বিনয় কৃষ্ণের বিরুদ্ধে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া পরিষদকে শোভাবাজারের রাজ-বাটীর আওতা হইতে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের একতল গৃহে লইয়া আসিয়াছিলেন। সেই সময় রাজা বাহাদুর 'সাহিত্য সভা'র সৃষ্টি করিয়া মনকে যথাসাধ্য প্রফুল্ল করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

কলিকাতা আসার ১০।১২ দিন পর আমার রোগ খুব বাড়িয়া চলিল ; এমন কি বসিতেও কষ্ট বোধ হইত, এই সময় সেণ্ট্রাল কলেজের অধ্যাপক হাইকোর্টের উকীল যোগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় আমার সঙ্গে দেখা করিতে আইসেন। বাঙ্গলা প্রাচীন সাহিত্য প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে কথা-বার্ত্তা হয়। তিনি বলেন "ঐ বটতলার ছাপা চাষাদের নাকী সুরে পড়া নাচাড়ী ছন্দের ভিতর কি ছাই ভস্ম আছে, যে আপনি তার জন্য জীবন পাত করিয়া খাটিয়াছেন—আপনি আমাকে—এই কথাটা বুঝাইয়া দিন।" আমি কবিকঙ্কণকে লইয়া বুঝাইতে সুরু করিয়া বলিলাম, "ধরুন কাল-কেতুর চরিত্র। যখন কবিকঙ্কণ তাঁর কাব্য রচনা করেন, তখন কবিরা 'তিল ফুল জিনি নাসা' 'অজানুলম্বিত বাহু''গৃধিনী জিনিয়া কর্ণ' 'রাম রম্ভা উরু' এই রূপ বহু সংখ্যক উপমা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র হইতে ধার করিয়া রূপবান্ ও রূপবতী নায়ক ও নায়িকাদিগকে সাজাইতেন। সেই যুগে সংস্কৃতের অলঙ্কার গুলি ডাকের সাজের ন্যায় অতি সস্তাদরে পাওয়া যাইত। যে কোন পল্লী-কবি সেই বাঁধিগৎ গুলি লইয়া পয়ার রচনা করিতে লাগিয়া যাইতেন। ইহার মধ্যে শক্তিশালী কবিকঙ্কণ হঠাৎ আসিয়া কাল কেতুব্যাধকে দাঁড় করিয়া তাহাকে বর্ণনা করিতে বসিলেন। তাহার মাথায় "জালের ছড়ি" বুকের উপর "বাঘের নখ," আর তার "দুই বাহু লোহার সবল।" পাঁচ বৎসর বয়সে সে "শিশু মাঝে যেমন মণ্ডল" ঐ বয়সে সে তাড়িয়া সজারু ধরে ও আকাশে যে পাখী উড়িয়া যায়, বাটুল দিয়া তাঁহাদিগকে লক্ষ করে। আরও একটু বড় হইলে বেশী বয়স্ক ব্যাধ বালকেরাও কেহ মল্ল-যুদ্ধে তার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। যাকে সে আঁকড়িয়া ধরে "তার হয় জীবন সংশয়।" সে কাব্যের নায়ক হইলেও যে তাহার বর্ণ অনিন্দ্য চম্পক পুষ্পের ন্যায় কিম্বা অগ্নি-অংশু'র ন্যায় হইবে, কবিকঙ্কণ তা হলফ করিয়া স্বীকার

করেন নাই। বরং তাহার বয়সের সঙ্গে সে বাড়িয়া চলিল এই কথা বলিতে যাইয়া তিনি নির্দয় ভাবে "ঘাড়ে যেন হাতী কয়া" কহিয়া একটা কালো অদ্ভুত জনোয়ার শাবকের সঙ্গে তার উপমা দিয়াছেন; কখনও পরিষ্কার করিয়া তাহার বর্ণের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছেন যেন "শ্যাম চামর কুন্তল।"

তাহার ছবিটি কবি একটুও সাজাইতে যান নাই, তাহাকে আঁকিতে যাইয়া অলঙ্কার শাস্ত্র একটিবারও তাহার মনে পড়ে নাই। যদিও তিনি রাজ-কুমারের গৃহ শিক্ষক-ছিলেন, এবং সংস্কৃতে যে তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল তাঁহার কাব্যেই তার অনেক প্রমাণ আছে। ব্যাধ-জগতটাই তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং সেই জগতের কদর্য্যতা, কুশিক্ষা ইহার কিছুই তিনি বাদ দেন নাই। কালকেতুর ভোজন বর্ণনা, করিতে যাইয়া গ্রাসগুলি তোলে যেন "তে আঁটিয়া তাল" বলিয়া কাব্য নায়কের "ভোজন কুৎসিৎ" বলিয়া ধিক্কার দিতেও ছাড়েন নাই; কিন্তু ব্যাধ-গৃহের পশুর হাড় পূর্ণ. অস্পৃশ্যা, দারিদ্র্য-পীড়িত, হীন অঙ্গিনায় এই যে কালকেতুকে তিনি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা সমস্ত কদর্য্যতা সত্ত্বেও তাঁয় কি রামের মত একটা মহৎ চরিত্রে পরিণত করিয়াছেন, এই খানেই তাঁহার বাহাদুরী। যখন ফুল্লরা তাঁহাকে হীন সন্দেহ করিয়া বলিল "তুমি কোন্ রূপসী কন্যাকে লইয়া আসিয়াছ? দুষ্ট কলিঙ্গ-রাজ তোমায় বধ করিয়া আমার জাতি মারিবে।" এই হীন সন্দেহে কাল-কেতু ক্রুদ্ধ হইল, প্রত্যেক নিরপরাধ ব্যক্তিই তখন সেই সন্দেহে বিরক্ত হইতেন। কালকেতু ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "মিথ্যা হলে চোয়াড়ে কাটিব তোর নাসা" অবশ্য ভদ্র ভাবে সে তার প্রেয়সীর মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সৌজন্য-পূর্ণ কথা বলিতে শেখে নাই। কিন্তু সে যে নিরপরাধ, তাহা এই কথায় চাষার ভাষায় খুব স্পষ্ট করিয়াই

বুঝাইয়াছে। মোট কথা, কবিকঙ্কণ এক মুহূর্ত্তও ভুলিয়া যান নাই—যে তিনি ব্যাধের চিত্র আঁকিতেছেন। তাহাকে শাস্ত্রের নিয়ম মানিয়া নায়ক করিতে যান নাই, যাঁহারা সেরূপ নায়ক চাহিবেন, তাহারা রূপ-গোস্বামী কৃত 'উজ্জ্বল নীলমণি' পড়ুন। সেই সকল নায়কের লক্ষণের একটিও কালকেতুতে নাই, অথচ কালকেতু মস্ত বড় কাব্য-নায়ক হইয়া আছে। কালকেতু ভগবতীতে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া তাহার কুটির ত্যাগ করিতে বলিল। এমন কি তাহার যে সামান্য শাস্ত্র জ্ঞান ছিল তাহা দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে স্ত্রীলোকের স্বামীর ঘর ছাড়িয়া অন্যত্র রাত্রি যাপন উচিত নহে—এইরূপ অপরাধে সীতারও বিপদ ঘটিয়াছিল। ভগবতীকে সে স্বামীর বাড়ী পৌছাইয়া দেবে কিন্তু একা নহে, "ফুল্লরা চলুক সাথে—চল বন্ধু জন পথে' একাকী নির্জ্জন পথে নহে—স্বজনগণ যে পথে থাকেন—ফুল্লরাকে সঙ্গিনী করিয়া সে সেই পথে তাঁহাকে লইয়া যাইবে। ব্যাধ-নায়কের নৈতিক দৃষ্টির যে তীক্ষ্ণতা দেখিতে পাই, তাহা গ্রাম্য ভাষায় ব্যক্ত হইলেও খুব বড় জিনিষ। ব্যাধের কথায় ভগবতী কোন রূপ কর্ণপাত করিলেন না, তখন গণিকা ভ্রমপূর্ব্বক সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া সে তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল—"ভানু সাক্ষী করি বীর ছুড়িলেক শর।" কিন্তু ধনুতে শর আটকাইয়া গেল। তখন রূপসী বলিলেন "আমি ভগবতী"—কালকেতু বিশ্বাস করিল না, "আমার মত পাপী, হীন জাতীয় হিংস্রপ্রকৃতি ব্যক্তি কি দেব-দয়ার কখনও প্রত্যাশা করিতে পারে সে যে একবারে অসম্ভব। তুমি হয়তঃ যাদুমন্ত্র জান, এইজন্য আমার শর ছুড়িবার শক্তি লোপ করিয়াছ।" যাঁহারা জপ তপ করিয়া মনে করেন তাঁহারা কত ধার্ম্মিক, তাঁদের সঙ্গে কালকেতুর তুলনা করুন। ইহার চরিত্র প্রকৃতই সাধু, কিন্তু সে হীনজাতীয় এবং তাহার ব্যবসায়টা হেয়, এজন্য সে বুঝিতে পারে নাই যে তাহার এমন কোন গুণ আছে যাতে করে

দেবী আসিয়া স্বয়ং তাকে কৃপা করিতে পারেন। এই একান্ত নিরভিমান স্বীয় হীনত্ব বোধে চূড়ান্ত বিনয়ী ব্যক্তিই যে প্রকৃত পক্ষে দেবীর কৃপার যোগ্য, তাহা কবি বুঝাইয়া দিয়াছেন।

তার পর দেবী নিজে কাঁখে করিয়া মোহরের কলসী লইয়া যাইতেছেন, তখন "মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি। ধন ঘড়া লইয়া পাছে পালায় পার্ব্বতী।" সুতরাং সে যে অশিক্ষিত কুসংস্কারবদ্ধ একটা জানোয়ার-বিশেষ, এক মুহূর্ত্ত কবি তাহা আমাদিগকে ভুলিতে দেন নাই। মুরারী শীল তাহাকে কিছু পয়সা ধারিত, অঙ্গুরীয় ভাঙ্গাইতে যখন সে তাহার নিকট গেল, তখন সে অন্দরে ঢুকিয়া লুকাইয়া রহিল এবং বেনেনী আসিয়া বলিল "আজি ঘরে নাহিক পোদ্দার" কিন্তু অঙ্গুরীয়কের কথা জানিতে পারিয়া মুরারি খিড়কির পথে হাজির হইয়া কালকেতুকে উল্টো দোষ দিয়া বলিল "শুন শুন ভাইপো—এবে নাহি দেখিতো"—এ তোর কেমন ব্যবহার।" কিন্তু কালকেতু উদার ও সরল প্রকৃতি। সে মুরারির কপটতা বুঝিতে চেষ্টা করিল না, বরং সে কাজের ভিড়ে আসিতে পারে নাই, তাই বলিয়া ক্ষমা চাহিল। সর্ব্বত্র গ্রাম্য ভাষার অমার্জ্জিত বর্ণে, মোটা বাঁশের তুলি দিয়া কবিচিত্রকর যে ছবিগুলি আঁকিয়াছেন তাহা বড় বড়। অভদ্র জীবনের চাল-চিত্র, কিন্তু ভিতরকার ভদ্রতা সেই বাহিরের নেংটীর অভদ্রতাকে আশ্চর্য্য ভাবে পাছে ফেলিয়া দিয়াছে। ফুল্লরা এই কালকেতুর যোগ্য স্ত্রী তাহার পদ্মপলাশ চক্ষু অথবা তিলফুল-বিনিন্দিত নাসিকা এবং কাদম্বিনী কেশের কোন উল্লেখ নাই, কবি লিখিয়াছেন—"এই কন্যা রূপে গুণে নামেতে ফুল্লরা, কিনিতে বেচিতে ভাল পারয়ে পশারা। রন্ধন করিতে এই কন্যা ভাল জানে। বন্ধুগণ মিলিয়া ইহার গুণ গানে।" ফুল্লরা তালপাতের ছাউনি, ভাঙ্গা ঘরে থাকিত, তাহার মধ্য-স্থলে ভোরাণ্ডার থাম ছিল, তাহা

বৈশাখী ঝড়ে রোজ ভাঙ্গিয়া পড়িত এবং "বৃষ্টি হলে কুড়্যায় ভাসিয়া যায় বাণ," জ্যৈষ্ঠ মাসে সে বইচির ফল খাইয়া একরূপ উপবাস করিয়া কাটাইত, এবং যখন মাংসের পশরা মাথায় করিয়া বাজারে যাইত, তখন "দেখিতে দেখিতে চিলে করে আধসারি।" শীত কালে সকলেই গরম বস্ত্রাদি পড়িত, কিন্তু "অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়।" আশ্বিন মাসে পূজার বলিদানের মাংস গৃহে গৃহে, ফুল্লরার মাংস বিকাইত না, তার কুড়ে ঘরে একটা গর্ত্ত ছিল, তাহাতে আমানি রাখিত, ও তাহাই খাইয়া জীবন—যাত্রা নির্ব্বাহ করিত, এক খানা মাটীর থালা কিনিবার ও কড়ি কুলাইত না। বসন্ত কালে মন্দ মন্দ সমীরণে মালতী কুসুম পরাগে ভ্রমর শ্লথ ভাবে মগ্ন হইত, যুবক যুবতীরা মদনোৎসবে মাতিয়া যাইত, কিন্তু "অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা।" এই নিদারুণ দুঃখ-চিত্রের বিভীষিকার মধ্য দিয়া কবি প্রেমের জয় দেখাইয়াছেন। যখন ভগবতী বলিলেন, "দেখ আমার অঙ্গের বহুমূল্য অলঙ্কার- আমি তোমার সমস্ত দুঃখ দূর করিব।" এত কষ্ট সহিয়া যে ফুল্লরার ধৈর্য্য অটুট ছিল, সে ফুল্লরা ভগবতীর এই কথায় কাঁদিয়া ফেলিল—তাহার দারিদ্র্য থাকুক, তাহার উপবাস শত গুণে ভাল, সে চায় না স্বামীর অধিকার অপরকে ছাড়িয়া দিতে—সে তা পারিবে না। সমস্ত দুঃখের মধ্যে তার প্রাণ-জুড়ানো সামগ্রী, সমস্ত ব্যাথার মধ্যে শান্তি,—তার ঐ স্বামীর প্রেম; সে জল ঝড় সহিবে, নিজে না খাইয়া স্বামীকে খাওয়াইবে—সে হরিণের ছড় পরিবে, বইচির ফল খাইয়া উপবাস করিবে—কিন্তু স্বামীর প্রেমের ভাগ বসাইতে সে দেবে না, সে নির্লজ্জার মত এ সকল কথা বলে নাই—কিন্তু ভগবতী যখন কিছুতেই ছাড়বেন না—তখন সে চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল—

এবং—

"কাঁদিতে কাঁদিতে রামা করিল গমন।
শীঘ্র গতি গোলা হাটে দিল দরশন॥
গদ গদ বচন চক্ষেতে বহে নীর।
ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন মহাবীর॥
শাশুরী ননদ নাই, নাই তোর সতা।
কার সঙ্গে ঝগড়া করি চক্ষু কৈলি রাতা॥

কোন নায়িকা এই ব্যাধ-মেয়ের মত প্রেম ও সাধুতা দেখাইতে পারিয়াছে ?

সেদিন আমার মাথার উৎকট ব্যধি সত্ত্বেও মুখ খুলিয়া গিয়াছিল ;—তারপর সেক্‌পীয়র হইতে সুরু করিয়া আমি টেনিসন পর্যান্ত অনেক কবিরে কবিত্বের বিশ্লেষণ করিলাম। আমার উপর যোগেন্দ্রবাবুর একটা শ্রদ্ধার ভাব হইল—বুঝিতে পারিলাম।

মস্ত বড় বক্তৃতা করার দরুণ পীড়া বাড়িয়া মড়ার মত বিছানায় পড়িয়া রহিলাম। দিন রাত্রি একটুও ঘুম হইল না। পরদিন দেখি যোগনবাবু আবার আসিয়াছেন, তিনি বলিলেন "ক্ষুদিরাম বাবু আপনাকে সেণ্ট্রাল কলেজের" উপরের শ্রেণী গুলিতে ইংরেজী সাহিত্য পড়াইতে নিযুক্ত করিতে চান, আপনি প্রস্তুত থাকিলে শীঘ্রই নিয়োগ-পত্র পাঠাইবেন।

আমি কাতর স্বরে বলিলাম, ",আমি উঠিতে বসিতে পারি না.—আমি জীবনে যে কখনও কাজ করিবার যোগ্য হইব—তাহার সম্ভাবনা নাই। ক্ষুদিরাম বাবুকে আমার নমস্কার ও ধন্যবাদ দিবেন।" যোগেন্দ্র বাবু সহানুভূতি দেখাইয়া দুঃখের সহিত বিদায় লইলেন।

এর পর আমার পীড়া এতই বৃদ্ধি পাইল যে মনে হইল, শীঘ্রই জীবন শেষ হইতে পারে, তখন আমার মাতুল চন্দ্রমোহন সেন আমার স্ত্রী-

পুত্রদিগকে পাঠাইয়া দিবার জন্য জগদীশ দাদার নিকট তার করিয়া দিলেন।

তাঁহারা সকলে আসিলে মাতুলালয়ে স্থানাভাব জনিত অসুবিধা হইতে লাগিল, আমি আমার মাতুল ভাই হেমকে বলিলাম, "তুই আমার জন্য বাড়ী খুঁজিয়া ঠিককর। প্রায় দেড়মাস এখানে রহিলাম, এখন আর মামারবাড়ীর সেরূপ শ্রী নাই, মামাত ভাইএরা কর্ত্তা হইয়াছে। এখানে আর থাক্‌ব না।" হেম বলিল—"তোমার হাতে কিছু নাই; সপরিবারে নিঃস্বম্বল অবস্থায় বাড়ী করিয়া কি ভাবে চলিবে?" আনন্দ বাবু তিন-মাসের অর্দ্ধেক বেতন ১২০ টাকা পাঠাইয়াছিলেন, তাহা হইতে খরচ যাইয়া ৭৬ টাকা কয়েক আনা বাকী ছিল আমি হেমের হাতে দিলাম।" হেম বলিল এতে কি হইবে? যা হোক যখন জেদ করিতেছে,তখন বাসা করিয়া দেই। তারপরে যা হবার হবে।" হেম তখন বি এ পাশ করিয়া 'ল' পড়িতেছি সে সন্ধ্যাকালে বাড়ী ঠিক করিয়া আসিল, রাজাবাগান জংসন রোড ১৪ নম্বরের বাড়ী. ভাড়া মাসিক ২২ টাকা।

পরদিন সেই বাড়ীতে উঠিয়া গেলাম। হেম বাজারের প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি কিনিয়া আনিয়া ৪৩ টাকা আমার হাতে দিল, কারণ আমার ঘটি বাটী বিছানা পত্র ও অপরাপর সমস্ত জিনিষই চন্দ্রমোহন দাস দাদা-মহাশয়ের বাটীতে কুমিল্লায় ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। ইহা হইতে বাড়ী ভাড়া ২২ টাকা দিয়া মোট ২১ টাকা হাতে রহিল।

আমি আমার এক বিশেষ বাল্যবন্ধু পাব্লিসারকে আমার সঙ্গে দেখা করিতে চিঠি লিখিলাম। ইনি পাব্লিসারী করিয়া বিস্তর টাকা করিয়া-ছিলেন। তাঁহাকে বলিলাম, "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রথম সংস্করণে ছয়শত ছাপা হইয়াছিল, তাহার রাজ সংস্করণের ১০০ শত বন্ধু বান্ধব ও সাহিত্যিক গণকে উপহার দিয়াছি। তারপর ত্রিপুরা রাজার ব্যয়ে বই

ছাপা হইয়াছে, রাজসরকারেরও অনেককে দিতে হইয়াছে। এখন বিক্রয় করিবার মতন ৪০০ বই আমার কাছে আছে। বইএর প্রশংসা চারিদিকেই হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের ইনস্পেকটার দীননাথ সেন সারকুলার দিয়াছেন যে প্রত্যেক স্কুলের একখানি কিনিতে হইবে। এই পুস্তকের প্রতি খণ্ডের মূল্য ৩৲ টাকা। স্কুলগুলি এখন বন্ধ, জৈষ্ঠমাস—স্কুল খুলিলেই বই বিক্রীত হইয়া যাইবে।" তাঁহাকে দীনবাবুর সারকুলার ও নানা পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনা গুলি দেখাইলাম এবং আরও বলিলাম, "আমার অবস্থা অতি শোচনীয় ১৫।২০ টাকা হাতে আছে, তা ছাড়া কুমিল্লার অর্দ্ধেক বেতন তিন মাসের টাকা আগ্রিম লইয়া আসিয়াছি, এ কয়েকটা টাকা ফুরাইলে আমরা না খাইয়া মরিব, তুমি আমার বাল্য-সুহৃদ, বইগুলি কিনিয়া নেও। এগুলি স্কুলে স্কুলেই কাটিয়া যাইবে, বাহিরে বিক্রয়ের দরকার হইবে না।"

পাব্লিসার মহাশয় বলিলেন, "তুমি কি চাও"। আমি বলিলাম "চারিশত খণ্ড পুস্তকের মূল্য হয় ১২০০ শত টাকা, আমি ছয়শত টাকা অগ্রিম পাইলে ছাড়িয়া দিতে পারি।" তিনি বলিলেন "এ বেশ ভাল প্রস্তাব, আমি এই দরেই কিনিয়া নেব।" আমি খুব উৎসাহিত হইলাম। ছয়শত টাকা পাইলে, তারপর আর দুইমাস পর হইতে ৪০৲ টাকা করিয়া অর্দ্ধ বেতন পাইব, তাহা হইলে ইহাতেই আমার বৎসর চলিয়া যাইবে। কিন্তু পাব্লিসার মহাশয় বাড়ী যাইয়া এক চিঠি লিখিলেন, "এখন আমার একটু টানাটানির সময়, তোমাকে নগদ দুইশত টাকা দেব এবং তারপর ছয় মাসের মধ্যে বাকী চারিশত টাকা শোধ করিব।" আমি ভাবিলাম "২০০, টাকা ও তো কিছু কম নহে" তখন আমার হাতের টাকা ত আরও ঢের কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাড়াতাড়ি তাহাতেই 'কবুল আছি' বলিয়া চিঠি লিখিলাম। আমার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া সম্ভবতঃ পাব্লিসারের ভয় হইল।